KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কল - ১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number ৪৭/৭ ৪৭/৮ ৪৭/৯ ৪৭/১১ ৪৭/১২	Year of Publication Nov 1986 Dec 1986 Jan 1987 March 1987 April 1987
	Condition : Brittle : Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

জানুআরি
১৯৮৭

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি-প্রকৌশল নিয়ে ভারতকে যদি একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করতে হয়, বর্তমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোয় কী কী রূপান্তর ঘটানো প্রয়োজন? এই নিয়ে ড. মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তীর প্রবন্ধ।

দেশের অর্ধেক মানুষকে দারিদ্র্যসীমার নীচে রেখে ভারত আজ দশম শিল্পোন্নত দেশ। তৃতীয় বিশ্বের এই রূপই সাম্রাজ্যবাদের মনঃপূত। আর এটাই সাম্প্রতিক ইউনেসকো-সংকটের মূলকথা। "আন্তর্জাতিক" বিভাগে ড. সৌরীন ভট্টাচার্যের তথ্যাশ্রিত অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ।

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানেরা সম্প্রদায়মনস্ক সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের গুটিয়ে আনছেন কেন? অতিপ্রকটভাবে অন্ধ-ধর্মীয়-ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয়ে উঠছেন কেন? এরই উত্তরসন্ধান আবদুর রউফের প্রবন্ধে।

একশ বছর আগে এই বঙ্গদেশে একদিকে ব্রাহ্মধর্মের মানবিকতার আদর্শ, অন্যদিকে ওয়াহাবি-ফরাজি আন্দোলনের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের আহ্বান—এই দুই টানের মধ্যে দোদুল্যমান শফিউজ্জামান নামে এক যুবকের আত্মজিজ্ঞাসা—এবারকার "অলীক মানুষ"-এর কথাবস্তু।

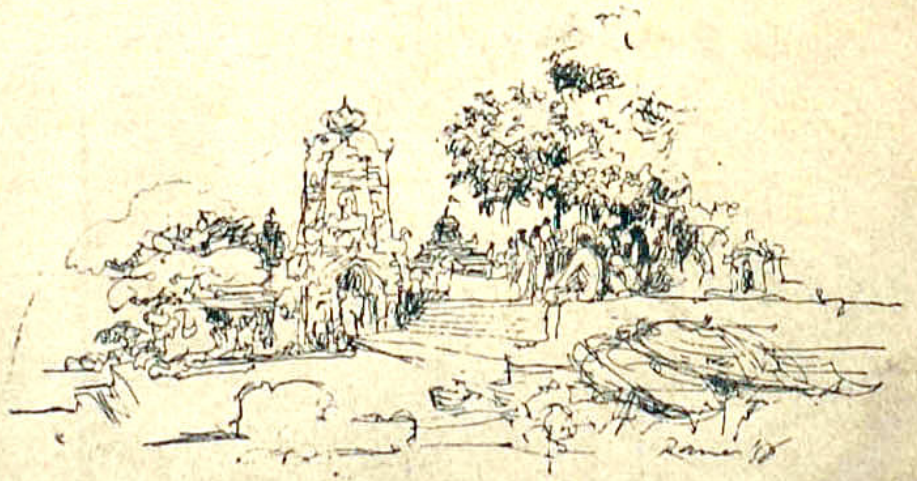

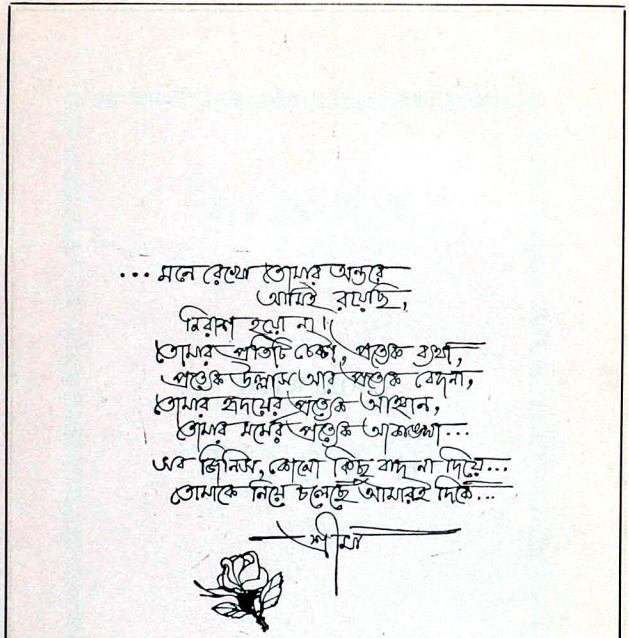

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

শ্রীমি

বর্ষ ৪৭। সংখ্যা ৯
জানুআরি ১৯৮৭
পৌষ ১৩৯৩

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি—ভারতের বর্তমান অবস্থা মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী ৬৭১

বিভাগোত্তর পশ্চিমবাঙলায় বাঙালি মুসলমানের
চিন্তাচেতনার গতিপ্রকৃতি আবদুর রউফ ৬৯২

ওলে শোইঙ্কা অভিজিৎ করগুপ্ত ৭০৫

ভালোবাসা ঈশ্বর ত্রিপাঠী ৬৭৬

কবির মাতৃভাষা সিকদার আমিনুল হক ৬৭৭

হরিজন রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭৮

মু'আল্লাকা খোন্দকার আসরাফ হোসেন ৬৭৯

অলীক মানুষ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৬৮০

প্রতিপক্ষ রফিকুর রশীদ ৬৯৯

আন্তর্জাতিক ৭১৯

ইউনেসকো সংকটের ভূমিকা সৌরীন ভট্টাচার্য

সমাজচিত্র ৭২৮

আদিবাসী সমাজে পশ্চিমী শিক্ষা দেবব্রত ঘোষ

বাংলাদেশ থেকে ৭৩৪

বিবেক, যুক্তি ও প্রগতি আবুল কাসেম ফজলুল হক

গ্রন্থসমালোচনা ৭৪০

বিনয় চৌধুরী

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ৭৪২

ভ্রান্তিবিলাস করবী দাশগুপ্ত

চিত্রকলা ৭৪৬

চীনা কাঠখোদাই প্যামেলা সরকার

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

NEW INDIA SUGAR MILLS LTD.

9/1, R. N. Mukherjee Road
Calcutta-700 001

P. O. HASANPUR SUGAR MILLS
DIST. SAMASTIPUR, BIHAR

MANUFACTURERS OF PURE CRYSTAL CANE SUGAR.

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি—
ভারতের বর্তমান অবস্থা

মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী

বর্তমান বিশ্বে শিল্পে অগ্রগতির মাধ্যম আধুনিক প্রকৌশল এবং প্রযুক্তি, যার ইংরাজি নাম টেকনোলজি। চারিদিকে প্রশ্ন শোনা যায় যে, আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় কতটা এগিয়ে বা পেছিয়ে আছি? একথাও প্রায় শুনতে হয় যে, বিশ্বের যেসব অনুন্নত দেশ আমাদের পরে স্বাধীনতা পেয়েছে, আমাদের পরিকল্পনায় আর তাদের পরিকল্পনায় কৌশলগত পার্থক্যের জন্য তারা অনেকখানি এগিয়ে গেছে। যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, বা সিঙ্গাপুর, বা এমন-কি চীন। জাপানকে ঠিক এই চৌহদ্দির মধ্যে টানা যায় না, কেননা জাপানে প্রযুক্তিবিপ্লব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই শুরু হয়েছিল। (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার পদানত হয়ে কিছুটা স্থগিত ছিল।) কিন্তু এখন জাপান কোনো-কোনো ক্ষেত্রে আমেরিকা বা ইউরোপের উন্নত দেশগুলির চেয়েও এগিয়ে গেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে ছয়টি পরিকল্পনা শেষ হয়েছে, সপ্তম পরিকল্পনা শুরু হচ্ছে। আমাদের তরুণ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন পনেরো বছরের মধ্যে আমাদের একবিংশ শতাব্দীতে কেবল পদার্পণ করলেই চলবে না, আমাদের বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের সমান হতে হবে, এবং তার জন্য প্রয়োজনমতো যে-কোনো উন্নত প্রযুক্তি যে-কোনো দেশের কাছ থেকে আমদানি করা যাবে। কিন্তু একই সঙ্গে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আমরা পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের মতো প্রযুক্তি আয়ত্ত করতে পারি, এমন-কি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এগিয়েও যেতে পারি—যেমন জাপান পেরেছে।

এই উদ্দেশ্য ঘোষণা করার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীই প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবে। কিন্তু গত চল্লিশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মনে আস্থার ভাব আসতে একটু দেরি হয়। কেননা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি যখন নেহরুর আমলে শুরু হয় তখনও এই উদ্দেশ্যই ঘোষণা করা হত। কিন্তু একে-একে ছয়টি পরিকল্পনা চলে গেছে, কিন্তু এর মধ্যে কেবল কয়েকটি বিষয়ে, যথা, আণবিক শক্তির প্রয়োগ, মহাকাশবিজ্ঞানের সীমিত ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি হয়েছে; এবং গত চল্লিশ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হওয়া সত্ত্বেও বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি বন্ধ করা ছাড়া আমরা অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ সফল হতে পারি নি। যে কয়টি সীমিত ক্ষেত্রে পেরেছি, সেখানেও কয়েকজন বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদকে স্বাধীনভাবে কাজ করার

সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, আর তাঁরা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন বলেই এইসব সাফল্য অর্জন করা গেছে। আণবিক শক্তির গবেষণার ক্ষেত্রে ড. হোমি ভাবা, মহাকাশবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ড. বিক্রম সরাভাই, এবং কৃষিগবেষণার ক্ষেত্রে ড. স্বামীনাথনকে এইসব ক্ষেত্রের সফল দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। কিন্তু কিছু বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রমের ঘটনাকে ক্রমোন্নতির দিকে ঝোঁক বলার মতো বাস্তব তথ্য আমাদের হাতে নেই। প্রকৃতপক্ষে, সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যে বাস্তব-বুদ্ধির প্রয়োগ আমাদের বৈষয়িক উন্নতির সোপান হতে পারত, তার তালিকা সংক্ষেপে এই :

প্রথম পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ষষ্ঠ পরিকল্পনা পর্যন্ত শিক্ষাকে—বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে—অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নি। তার ফলে, আজ পর্যন্ত দেশের প্রায় ৭৫ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৫০ কোটি নিরক্ষর, এবং তার অর্ধভাগ বয়স্ক নিরক্ষর। যেহেতু আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগেরও বেশি লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, সেই কারণে এই নিরক্ষরতা আমাদের কৃষি-উৎপাদনকে তথা কৃষিভিত্তিক শিল্পের অগ্রগতিকে ব্যাহত করেছে। তা ছাড়া, স্বাস্থ্য, পরিবার-সীমিতকরণ এবং পরিবার-কল্যাণ কর্মসূচী গত তিন দশকে অত্যন্ত সামান্যই এগিয়েছে। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস আর কুসংস্কারের প্রভাব আমাদের জনসাধারণের বৃহৎ অংশকে জাতিভেদ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, অস্পৃশ্যতা, সংক্রামক ব্যাধির প্রতিষেধক টিকা নেওয়ার বিরুদ্ধতা—এরকম শিকলে বেঁধে রেখেছে। দুঃখের বিষয়, বহু রাজনৈতিক দলই অনেক ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ আচরণের বিরুদ্ধে যেতে ভয় পায়। সম্প্রতি শরিয়ত নিয়ে দেশের রাজনৈতিক মঞ্চে যে অভিনয় হয়ে গেল, সেই ঘটনাই প্রমাণ করল যে আমাদের "জেট"যুগীয় প্রধানমন্ত্রীও নিতান্তই ভোটের লোভের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হলেন, যেখানে উচ্চ আদালতের মত সম্পূর্ণ আধুনিকযুগীয় ছিল।

তাই, যে প্রযুক্তি সর্বাগ্রে প্রয়োজন তা হল আমাদের এই বৃহৎ জনসমষ্টিকে একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে (পাঁচ বৎসরের বেশি নয়) নিম্নতম প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। তার জন্য চাই আজকের আধুনিক প্রযুক্তি—রেডিও, টেলি-ভিসন, ভিডিও টেপ; প্রথাবহির্ভূত শিক্ষা, নিরন্তর শিক্ষা, মুক্ত শিক্ষার সর্ববিধ আয়োজনে কার্পণ্য না করা। এখনকার ৫০ কোটি নিরক্ষর, এবং প্রতি বৎসর সাড়ে আট-নয় কোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ছাত্রছাত্রী—তাদের সবাইয়ের জন্য সরকারের যে নূতন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে উল্লেখ থাকলেও পরিকল্পনার বাস্তবায়নের উপযুক্ত কাঠামো এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয় নি।

ইতিমধ্যে, কেন্দ্রীয় সরকার এবং কতকগুলি রাজ্য সরকারের মধ্যে, আমার মতে, অহেতুক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে—কয়টি আদর্শ বিদ্যালয় হবে, আদৌ হওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা, শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন জাতপাত সৃষ্টি করা হচ্ছে ইত্যাদি। আমাদের এই কথাটা তলিয়ে বোঝা প্রয়োজন যে, যে প্রকৌশল বা প্রযুক্তিই আমরা আজকের উন্নত প্রযুক্তির দেশ থেকে আমদানি করি না কেন, তা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে তার থেকেও উন্নত প্রকৌশল আর প্রযুক্তি নিজেদের দেশে সৃষ্টি করতে হলে কেবলমাত্র গুটিকয়েক প্রকৌশলী বা ইনজিনীয়ারকে প্রশিক্ষণ দেওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন—তাদের তলায় যাঁরা কাজ করবেন—তা কৃষিতেই হোক, কল-কারখানাতেই হোক, আর অন্যত্রই হোক—সেই ভিত্তিভূমিতে ন্যূনতম শিক্ষায়, অর্থাৎ অন্তত প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি। অতএব প্রযুক্তিবিপ্লবের প্রথম পর্ব শিক্ষাদানের প্রযুক্তির বিপ্লব, এবং তার জন্য প্রশিক্ষিত মানুষ তৈরির পরিকল্পনা। ভারতে এখন প্রায় ৪০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার নানা পর্যায়ে আছে। তার মধ্যে প্রায় পাঁচ ভাগ উচ্চ-কারিগরি শিক্ষার পর্যায়ে রয়েছে। অর্থাৎ, প্রায় দুই

লক্ষের এক-পঞ্চমাংশ বা ৪০ হাজার ছাত্রছাত্রী নানা পর্যায়ের কারিগরি শিক্ষায় রত। কিন্তু এর একটা বড়ো অংশ উৎপাদনভিত্তিক কর্মে না গিয়ে উচ্চস্তরে পরিচালনা, প্রশাসনিক কাজ ইত্যাদিতে চলে যায়। সবচেয়ে মেধাবী অংশেরা প্রথমেই চেষ্টা করে আমেরিকায় বা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে যেতে—সেখানে প্রযুক্তিবিদরা ভালো উপার্জন করতে পারে। এদের সংখ্যা এখন সারা ভারতে প্রায় দশ হাজারের মতো। বাকিদের মধ্যে বেশির ভাগই প্রথমে শিল্পে বা অন্যত্র জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করে। সবচেয়ে কম অংশ আসে শিক্ষাব্যবস্থায়—তাও আসে কোনো টানে নয়, অনন্যোপায় হয়ে। সুতরাং এই অংশকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক প্রাথমিক শিক্ষার আধুনিকীকরণ ঘটাতে হবে। উন্নত প্রযুক্তির দেশে ছোটো ছেলেমেয়েরা কমপিউ-টারকে খেলনার মতো ব্যবহার করতে শেখে—অবশ্য তাদের মান অনুযায়ী। সুতরাং, আমরা যদি উন্নত প্রযুক্তি এখনকার মতো আমদানি করে, পরে তাদের সমান তালে চলতে চাই, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সেইসব দেশেরই মতো প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আজকাল এমন উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে যাতে বয়স্কদেরও অত্যন্ত অল্প সময়ে এ বিষয়ে সাধারণ প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে আমরা সপ্তম পরি-কল্পনাকালে উল্লিখিত কার্যসূচীকে বাস্তবায়িত করার দিকে এগিয়ে যাব, তাহলে প্রাথমিক শিক্ষার পর যে প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন তা হল জনসংখ্যা-সীমিতকরণের প্রযুক্তি। এজন্য একদিকে চাই এখন পর্যন্ত যতগুলি উপায় সার্থকভাবে প্রয়োগ করে ফল পাওয়া গেছে, চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের সাহায্যে তাদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করে পরিবারকল্যাণ-কর্মসূচীর রূপায়ণে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা। জন-সংখ্যার দিক থেকে আমাদের সঙ্গে তুলনীয় চীন "একটি সন্তানই যথেষ্ট" কার্যক্রম গ্রহণ করতে পেরেছে। একদিকে তার যেমন সুফল আছে, অন্যদিকে সাম্প্র-তিক কালে কুফলও দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া, নানা রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণে আমাদের দেশে এ ধরনের কঠোর নীতি সফল করা দুঃসাধ্য। তবে "দুই বা তিন সন্তান, দুই হলেই ভালো"—এই নীতিকে যদি দেশের ৫০ কোটির বেশি নিরক্ষর মানুষের উপর প্রযোজ্য করতে হয় তাহলে ব্যাপক বয়স্ক-শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষা, এবং মহিলাদের চেতনা জাগানো প্রয়োজন। সব সম্ভাব্য এবং নিরাপদ উপায়ে পরিবার-সীমিতকরণ কার্যক্রম সার্থক করে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা-আর পুরুষ-কর্মীর প্রয়োজন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভিডিও টেপ এবং প্রদর্শনের উপযুক্ত ফিল্মের দ্বারা এক-একটি গোষ্ঠীকে এই শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করা সম্ভব। সমস্ত স্কুল, গ্রামসেবাকেন্দ্র, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান—সকলকেই কাজে লাগাতে হবে। আবার নির্দিষ্ট সময়সূচীর মধ্যে এক-একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের মাধ্যমে লক্ষ-লক্ষ শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা এবং পরিবারকল্যাণের পর যে কর্মসূচীর জন্য প্রযুক্তি দরকার তা হল—গ্রাম-ভিত্তিক বিকেন্দ্রিত স্বয়ংনিযুক্তি প্রকল্প, যা অতীতের গান্ধীবাদী চিন্তাধারা এবং বর্তমান চীনের গ্রামভিত্তিক কার্যধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে করা যেতে পারে। গান্ধী-জীর পরিকল্পনা ছিল : উৎপাদন এবং বন্টন গ্রাম-ভিত্তিক হবে। চীনে গ্রামসমষ্টিকে নিয়ে গ্রাম-সরকার এবং কয়েকটি গ্রাম-সরকারকে নিয়ে শহর-সরকার গঠন করা হয়েছে। কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্প, বণ্টন, উদ্বৃত্ত বিক্রয় এবং কেন্দ্রীয় ভাণ্ডারে জোগান দেওয়া—সবই এদের মাধ্যমে হয়। আমাদের দেশেও পঞ্চা-য়েতব্যবস্থা আর সমবায়ের ভিত্তিতে এইরকম ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সমবায় আন্দোলন যে কত কার্যকর হতে পারে আমাদের দেশের গুজরাতের ক্ষুদ্র সমবায় তার সার্থক দৃষ্টান্ত। তামিলনাড়ুতে, অন্ধ্রে,

কর্ণাটকে, মহারাষ্ট্রে, এমন-কি পশ্চিমবঙ্গেও তাঁতের ক্ষেত্রে এই আন্দোলন যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে—সামগ্রিকভাবে না হলেও আংশিকভাবে। যদি চেষ্টা আর সরকারি সাহায্য থাকে, গ্রামীণ অর্থনীতিকে এর সাহায্যেই জোরদার করা যেতে পারে। কিন্তু এই সমবায়পদ্ধতিকে উপযুক্ত রূপ দেওয়া, তাকে সার্থক করার জন্যও বহু প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন। দেশে কয়েকটি সমবায়-প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র আছে। আরও বেশি সংখ্যায় তা স্থাপন করা প্রয়োজন। এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাহায্যে এই আন্দোলনে জোয়ার আনতে পারলে সমগ্র গ্রামাঞ্চল জেগে উঠবে। গুজরাতে, মহারাষ্ট্রে এবং উত্তরপ্রদেশে সমবায়গোষ্ঠীর মাধ্যমে কেবল গ্রামভিত্তিক বা কৃষিভিত্তিক শিল্পই নয়, বৃহৎ শিল্প (যথা চিনি, সার, ফল-আর সবজি-সংরক্ষণ ইত্যাদি) এখনও বেশ লাভদায়ক এবং বহু ব্যক্তির কর্মসংস্থানের সহায়ক বলে পরিগণিত হয়েছে। বহু লোকের যথাসম্ভব কর্মসংস্থানই আমাদের কাম্য, এবং যে প্রযুক্তি তার ব্যবস্থা করতে পারে, তাকেই আমরা বলব উপযুক্ত প্রযুক্তি (রেলেভ্যান্ট্ টেকনোলজি)। এর পর আমরা ভাবব সর্বাধুনিক প্রযুক্তির কথা। কিন্তু সেই প্রযুক্তিকে আমাদের গ্রামভিত্তিক এবং সমবায়-ভিত্তিক প্রযুক্তির সঙ্গে—যে প্রযুক্তি বহু লোকের কর্মসংস্থান করতে পারে, তার সঙ্গে—সাযুজ্য রেখে, একটির সঙ্গে আরেকটি খাপ খায় এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে। শেষ পর্যায়ে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। এখানে সেই কমপিউটার-সমৃদ্ধ যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিকসের সুপ্রয়োগ করে উড়োজাহাজ থেকে মোটরগাড়ি, টেলিভিসন থেকে সামরিক সরঞ্জাম এবং ভোগ্যপণ্যাদি উৎপাদন করা যাবে। এর মধ্যে কিছু দেশের লোকের প্রয়োজন মেটাবে, আর বেশির ভাগ রপ্তানি হবে বিদেশী মুদ্রা অর্জনের জন্য। সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে অধিকাংশ কাঁচামাল পাওয়া যায়; কিন্তু সেসব খনিজ বা কৃষিপণ্য হিসাবে রপ্তানি হয়ে যায়। কাঁচামালকে উপযুক্ত ভোগ্যপণ্যে পরিণত করে দেশে এবং বিদেশে ব্যবহারযোগ্য উপযুক্ত মানের সামগ্রী করতে হবে, এবং এমন মূল্যে করতে হবে যা অপরাপর দেশের—যেমন, জাপান বা চীন বা কোরিয়া বা ইউরোপীয় উন্নত দেশগুলির সমান হতে পারে।

এখানেই ওঠে কুশলী উচ্চস্তরের প্রযুক্তিবিদদের কথা। তাঁদের প্রশিক্ষণ দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গুলিতে দেওয়া হচ্ছে। তার মান আমেরিকা বা জারমানি বা জাপানের মানের মতো করা কিছু শক্ত নয়। অনেক ক্ষেত্রে—যেমন উন্নত মানের ইনজিনীয়ারিং বিভাগে, এবং আই-আই-টিতে ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে যে হাতেকলমে কাজ শেখার ব্যবস্থা আছে, তা এদেশে নেই। কেননা, যখন শিক্ষানবিস হিসাবে তাদের কোনো উন্নত কারখানায় পাঠানো হয় তখন সেখানে তাদের প্রতি যত্ন নেওয়া হয় না। বিদেশে কিন্তু প্রকৌশল-শিক্ষার্থীর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে করা হয়, এবং কলকারখানাগুলি এটাকে তাদের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করে। এখানে সরকারি প্রশাসন এবং কারখানার প্রশাসনের যৌথ দায়িত্ব আছে, এবং সেই দায়িত্ব উপযুক্তভাবে পালনের উপর ভবিষ্যৎ প্রকৌশলীর দক্ষতা নির্ভর করে। এ ঘটনা আমাদের দেশে না ঘটার কথা নয়। যেখানে এই দায়িত্বজ্ঞানের অভাব আছে, সরকারি আইনে সেই অভাব দূর করতে হবে।

আর-একটি বিশেষ অভাব দূর করতে হবে কারিগরি পরিচালনার উন্নতিসাধনে। আমাদের দেশে কারিগরি গবেষণার গত সাড়ে তিন দশকের বেশি ইতিহাস এই যে, বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা পরিষদ (সি-এস-আই-এর) এবং তার প্রায় ৩২টির বেশি গবেষণালয় দেশকে এমন কোনো প্রযুক্তি দিতে পারে নি যাতে দেশ স্বনির্ভর হতে পেরেছে। গবেষণায় অনেকটা সাফল্য দেখিয়েছে আণবিক-গবেষণা-কেন্দ্র, মহাকাশ-গবেষণা-কেন্দ্র, কৃষি-গবেষণা-কেন্দ্র, এবং কিছুটা সামরিক-প্রতিরক্ষা-গবেষণা-কেন্দ্রগুলি।

বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা পরিষদের কেন্দ্রগুলি গতানুগতিক এবং বিদেশের গবেষণার পুনর্বার অনুকরণ ছাড়া কিছুই করতে পারে নি। কিন্তু কেন এই অবস্থা? যথেষ্ট প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের নিযুক্ত করা হয়েছিল এখানে, কিন্তু খানিকটা সরকারি নিয়মবিধি-নিষেধের বেড়াজালের জন্য, এবং তেমন কিছু কাজ না করলেও চাকরিতে মোটামুটি উন্নতির ব্যবস্থা চালাও-ভাবে থাকায় এইসব সংস্থার বিজ্ঞানীদের মধ্যে তেমন কর্মোদ্যোগ এতাবৎ পরিলক্ষিত হয় নি। তা ছাড়া, শিল্পের সঙ্গে এবং বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণার সঙ্গে এঁদের সংযোগ অত্যন্ত অল্প।

আমাদের প্রযুক্তি-গবেষণার যদি উন্নতি করতে হয়, তাহলে শিল্পের গবেষণা, বিজ্ঞান ও কারিগরি গবেষণা পরিষদের গবেষণা, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষ করে প্রযুক্তিবিজ্ঞানশিক্ষাদানকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষণাকে একত্র করে সমস্যাভিত্তিক সমাধান খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। সেই চেষ্টা এখনও হয় নি। জাপানে এটা হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশ-গুলিতেও তা আছে। সুতরাং আমরা তার ব্যতিক্রম হলে ফলও সেইরকম ব্যতিক্রমই হবে।

বর্তমানে মানবসম্পদবিকাশ নামে একটি নতুন মস্ত্রক হয়েছে। এই মন্ত্রকের প্রথম বক্তব্য "চ্যালেনজ টু এডুকেশন" নামে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে। তাতে সমগ্র মানবসম্পদবিকাশের মূল যে শিক্ষা, তা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কিছু পর্যালোচনা, কিছু বিতর্ক, অত্যন্ত ধোঁয়াটে কিছু কথা ছাড়া মানবসম্পদবিকাশের কোনো নতুন রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। উপরন্তু তার জন্য যথেষ্ট সম্পদও বরাদ্দ করা হয় নি। অতএব আমরা যদি তৎপর না হই তাহলে সপ্তম পরিকল্পনার পরও ফল একই থাকবে। আমরা ক্রমাগত অন্য দেশ থেকে প্রযুক্তি আমদানি করব, এবং আমাদের মাথাপিছু বিদেশী ঋণ বাড়বে।

তাই, স্বনির্ভরতার জন্য তৎপরতার কোনো বিকল্প নেই।

ভালোবাসা

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

আমার রাত্রির ঘুম তুমি। দিনের জেগে থাকা।
তোমার ওই ক্রীমনরম হাতে সময়যম করাত। তুমি আমার চোখের
ওপর চালিয়ে দাও প্রথমে। আতঙ্ক নিংড়ে উপড়ে আসে তারা।
ফাটানো ডিমের মতো ছিটকে যায় সাদাটে মাংসপিণ্ড। তরলাভ
হলুদ।
বোবায় ধরা আমার স্বরযন্ত্র নিঃসাড়। আমার পাপ পঙ্গু করে রেখেছে
আগেই।
তবু আমি দুহাতের দশ আঙুল জড়ো করে মিনতি জানাই। জিভ
ফেড়ে গোঙানি বেরিয়ে আসে শব্দহীন।
তবু আমি ব্রহ্মতালুর গুহায় বাজতে শুনি প্রায়শ্চিত্তের ঢাক।
চুল দিয়ে মুছিয়ে দিতে চাই পায়ের পাতা।
তুমি করাতের দাঁতগুলো পরীক্ষা করে নাও তোমার ঠোঁট বুলিয়ে।
মরে-যাওয়া স্তনকোরকে রাখো এক মুহূর্তের শ্রান্তিভরে।
আমি কোনো শিশুখেলেনা ঝরির জলমর্মরে অনিশ্বাস টেনে
নিতে খুঁজি। তোমার নির্মম হাতের দৃঢ় কবজিতে ধরা সেই করাত
নেমে আসে আমার বুক উজিয়ে।
ঠিকঠাক হৃৎপিণ্ডের কেন্দ্রে বসিয়ে তুমি মনোবাসনার টান
দাও হাতলে।
অক্লান্ত করাতের ঘসঘস শব্দ একদিকে। অন্যদিকে তোমার
অনুপম সৌন্দর্যের জিঘাংসা গ্রন্থিল শরীরশিরায়
টান দেওয়া মসৃণ হাতল।
দুইয়ের নীচে, অনেকাল্প নীচে আমার মন নাভিকমল ও
সমুদ্ভত মৃণাল।

কবির মাতৃভাষা

সিকদার আমিনুল হক

হয় না কিছুই শেষতক! ক্রমাগত পণ্ডশ্রমে
হতাশার অন্ধকারে রাহুগ্রস্ত একটি বিকেল
কাটিয়ে সন্ধ্যায় যাই ক্লান্ত দেহে নিজস্ব নিবাসে।
ক্রমে রাত্রি নেমে আসে, কুয়াশায় কিংবা গ্রীষ্ম-দাহে;
অ্যাসফল্ট্ চষে-চষে স্তবগান করি ব্যর্থতার!
আঙুল নাচিয়ে কেউ তুড়ি ছায় পাশের বাড়িতে;
চলতি গজল থেকে ঝরে পড়ে চন্দনের ফোঁটা—
সকলেই সম্মোহিত, ঠাটেবাটে বাঁচবার তৃষ্ণা
জানায় অকুতোভয়ে, স্পর্শ করে কাম্য স্তনভার।

কেন যে আমাকে দিলে ডোরাকাটা বাঘের জীবন
তাই ভাবি! করি নি ডাগর পাপ, আততায়ী নই—
মাধুর্য, সৌন্দর্য, এইসব সামান্যর প্রতীক্ষাকে
উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভেবে-টেবে কেন তুমি অশ্লীল তাকাও?
নিবদ্ধ আমার দৃষ্টি জঙ্গলের সাদা জ্যোৎস্নায়;
হরিণের উপমায় কিছু পঙক্তি পেলে ছিঁড়েখুঁড়ে
মেটাই ক্ষুধার জ্বালা, সেই অর্থে আমি মাংসাশী;
মাতৃভাষা নিয়ে আমি উদয়াস্ত কাটাই প্রহর।

বাংলাদেশ

হরিজন

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দারুণ, তুমি দাও নি জল, আগুন দিলে শুধু—
পোড়ালে এই শরীর, চিরজন্ম জুড়ে আমি
দগ্ধ ঘুমে কাটাব রাত, ফোসকা ফেটে রস
গড়াবে, তার দহন নিয়ে কাটাব সারাদিন।
ভেবেছিলাম সন্ন্যাসীর শান্তিমেঘবারি
ধরেছ নিজে, আমাকে দেবে চৈত্র শেষ হলে
চৈত্র গেল, বৈশাখের প্রহর হল শেষ
দারুণ, তুমি দিলে না মেঘে জলের প্রতিভাস।

গোপন, তুমি হারিয়ে দিলে হারানো জঙ্গলে ;
যে-কথা ছিল বলার, তাকে কবর দিয়ে রাতে
বাড়ি ফেরার পথেই দেখি মেঘের থাবা, নখ ;
আকাশ জুড়ে অসম্ভব চাঁদের ছোঁড়াছোঁড়ি—
আমি কি ভয়ে এসব কথা কিছুই বলব না ?
এমনকি, যে-ভাঙা সেতুর উপরে এক প্রেত
দাঁড়িয়েছিল, বাড়ি ফেরার পথেই তাকে আমি
দেখেছিলাম ছুঁড়ে দিতে রক্তমাখা হাড় ?

উড়াল, তুমি হলে না ত্রাণ, শিকড় হয়ে আছি
মাটির চাপ সহ্য ক'রে, হলে না তুমি ভেলা,
জলস্রোত আমাকে তার গহনে টেনে নিতে
বৃক্ষ খেপে আগুন হল আমার 'পরে আজ
বজ্র এসে দেখাল তার নখর তর্জনী,
আকাশ জ্বলে উঠল, মুখে বিদ্যুতের বিভা,
উল্কামুখে শাপশাপান্ত করল নভোদেশ,
উড়াল, তুমি হলে না ত্রাণ, জন্ম গেল জ্বলে।

নোঙর, তুমি দিয়েছ শুধু জলের চিৎকার,
ঢেউয়ের সাম্রাজ্য থেকে ব্রাত্য করে দিলে,
একদা ছিল অবগাহন, শঙ্খ নিয়ে আজ
কী হবে বলো ! সমুদ্রের শস্য দিলে না।

মু'আল্লাকা

খোন্দকার আসরাফ হোসেন

ঘুমের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলাম এক পিপে মদ
প্রান্তরেরই গানের মতোন গুচ্ছায়িত আঙুরথোকার
মগ্ন মাছি ঘুমিয়ে ছিলাম, রোদের দুপুর
ঘুমিয়ে ছিলাম কাঠের পিপেয় একটু বেহদ
তন্দ্রালসা সন্ধ্যা এলে চোখ খুলি নি মুখ দেখি নি

ঘুঙুরেরই অলীক বেদন কণ্ঠে নিয়ে অশ্বারোহী কোন্ দূরে যায়
কোন্ দূরতর নাচের আসর মত্ত হল হেল্লিজায়।

তোমরা বল মদের মধ্যে কাঁদছে কানাই
তমাল তরু কদম্বেরই শাখায় শাখায় কাচের চুড়ি
ঝনাত ঝনাত ঝিনিক ঝিনি, কিবা কোনো আপেল-গুহায়
ভালুকথাবায় প্রাণ হারাল যেই নবীনার করুণ সানাই

অন্ধ কোনো কবির হাতে বিষম গেলাস, থুতনি বাঁকা
বুকের ভেতর দুঃখ-নিশির অশ্রুপ্রপাত, মু'আল্লাকা।

ঘুমের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিলাম এক বুনো হাঁস
কপিশ কালো জলের মাছায় আমন ধানের নিটোল স্বরে
কাঁপছিল ঘাস, দলকলমীর পাতায় পাতায় শ্রাবণরাতের
চোখের পানির হাজার প্রাসাদ, শ্যাওলাদামের অকটোপাসে
বাঁধছিল তার সকল সরোদ মনের মোহন আমজাদ আলি

হঠাৎ পেশী প্রস্ফুটিত জলের পদ্ম কোন শিকারীর মত্ত বীণা
এক পিপে মদ ঢালল জলে অন্ধকারের প্রসার্পিনা।

বাংলাদেশ

অলীক মানুষ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সতেরো

"I go and come with a strange liberty in Nature,
a part of herself..."

নুরপুর বাসুকের কুঠিয়াল রিচার্ড স্ট্যানলিকে হত্যা করে যখন আশ্রমে পৌঁছাই, তখনও মন্দিরে খোল বাজিয়ে ব্রহ্মকীর্তন চলেছে। হরিবাবুর কুটির হয়ে এসেছিলাম। তিনি এগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে বারণ করি। মন্দিরের পেছন ঘুরে ঘরে ঢুকে দ্রুত ভিজে কাপড় বদলে নিই। মন্দির থেকে যেটুকু আলো আসছিল, তাতেই চোখে পড়ে, কাপড়-চোপড়ের সব রক্ত ধুয়ে যায় নি। সেগুলি নিয়ে কী করব ভাবছি, সেই সময় স্বাধীনবালা এসে গেল। বললাম, কাজ শেষ। বখশিস দাও। অমনি স্বাধীন আমার পাদুটো ছুঁয়ে প্রণাম করল আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার দেহে-মনে তীব্র আনন্দস্রোত বয়ে গেল। সম্ভবত ইতিহাসে এই প্রথম এক হিন্দু যুবতী একজন মুসলমান যুবককে প্রণাম করল! এ স্বপ্ন না সত্য? বিচলিত বোধ করছিলাম। প্রণামের পর সে সোজা হলে তার শ্বাসপ্রশ্বাসের ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ল আমার মুখে। আবিষ্টভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে বলে উঠল, হরিদা কোথায়? তাকেও প্রণাম করতে চাই। এবার আমার ভাবাবেগটুকু নিমেষে ঘুচে গেল। আঃ! কী ভেবেছিলাম আমি? বললাম, হরিবাবু তাঁর কুটিরে আছেন। কিন্তু আমার একটু প্রব্লেম হয়েছে। এই জামাকাপড়ে স্ট্যানলির রক্তের ছোপ আছে। এখনই এর একটা বিহিত করা দরকার। স্বাধীন কাপড়ের পিণ্ডটি আমার হাত থেকে নিয়ে বলল, আমি পুঁতে ফেলব। তুমি ভেবো না। সে চলে গেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকলাম, স্বাধীনের এই প্রণাম কৃতজ্ঞতামাত্র। সে আমাকে প্রণাম করে নি, করেছে তার পিতৃহত্যার প্রতিশোধগ্রহণকারীকে।

আমি মানবেতর প্রাণী হলেও এক্ষেত্রে আমাকে সে প্রণাম করত। এইসব কথা যত ভাবলাম, তত ক্ষোভ-দুঃখ অনুশোচনা আমাকে জর্জরিত করতে থাকল। সে রাতে ভোজনশালায় গেলাম না। কেউ আমার খোঁজ করতেও এল না। দেবনারায়ণদার ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত কিসের আলোচনা হচ্ছিল। বাইরে সে এক ভয়ঙ্কর শরৎকালীন জ্যোৎস্না। আমি বিনিদ্র। নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মাল। স্ট্যানলিকে কেন আমি হত্যা করলাম? এই বিশ্বজগতে স্ট্যানলি-নামক এক গোরার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক ছিল? পান্না পেশোয়ারিকে আঘাতের অবশ্য একটা কারণ ছিল। সিতারা নিশ্চয় নিমিত্তমাত্র। পান্না পেশোয়ারির জঘন্য সমকামী স্বভাবই আমার ওই আচরণের কারণ। কিন্তু স্ট্যানলির সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় পর্যন্ত ছিল না। তাহলে কেন তাকে হত্যা করলাম? কেন, কেন এবং কেন? ক্রমাগত এই প্রশ্নের ফলে অবশেষে কয়েকদিনের মধ্যে ধর্ম জিনিসটাকে ঘৃণা করার অত্যদ্ভুত সিদ্ধান্ত আমাকে গ্রাস করে। জিনগ্রন্থের মতো একলা, জনহীন কোনো স্থানে থুথু ফেলে মনে-মনে বলি, ঘৃণা ধর্মকে—যা মানুষের মধ্যে অসংখ্য অতল খাদ খুঁড়ছে। ঘৃণা, ঘৃণা এবং ঘৃণা! ধর্ম নিপাত যাক্। ধর্মই মানুষের জীবনে যাবতীয় কষ্ট আর গ্লানির মূলে। ধর্ম মানুষকে হিন্দু অথবা মুসলমান করে। ধর্ম মানুষের স্বাভাবিক চেতনা আর বৃত্তিকে ঘোলাটে করে। তার চোখে পরিয়ে দেয় ঘানির বলদের মতো ঠুলি। স্ট্যানলিহত্যার পর সারা এলাকায় হইচই পড়ে গিয়েছিল। নুরপুরে গোরাপলটন এসে ছাউনি করেছিল। পুলিশবাহিনী গ্রামে-গ্রামে হানা দিয়ে যাকে খুশি ধরে নির্মম জুলুম করছিল। তারা ব্রহ্মপুর নয়া আবাদেও যখন-তখন এসে হাজির হত। কিন্তু দেবনারায়ণদার সঙ্গে জমিদারিসূত্রে জেলার ইংরেজ কর্তাদের পরিচয় ছিল। তা ছাড়া অর্ধশতাব্দীকাল ব্রাহ্ম আন্দোলনের নির্দোষ ধর্মকর্মের ঐতিহ্যটি ইংরেজের চোখে তত সন্দেহযোগ্য সাব্যস্ত হয় নি। বরং, আমার মতে, কলিকাতার ব্রাহ্ম নেতারা ইংরাজ-শাসনের পৃষ্ঠপোষকতাই করে এসেছেন, সমালোচক ভূমিকাটিকে আমি 'শত্রুরূপে ভজনা'ই বলতে চাই। এসব কারণেই ব্রহ্মপুর আশ্রমে পুলিশকর্তারা এসেই স্মিতহাস্যে বলতেন, জাস্ট এ রুটিন ওয়ার্ক, দেব-নারায়ণবাবু! ভাগ্যিস যামিনী মজুমদার ব্রাহ্ম কিংবা আশ্রমের লোক ছিলেন না! পুলিশদল ব্রহ্ম-পুরে আসবে ভেবে আমি সারাদিন আবাদের জঙ্গল-এলাকায় কাটাতাম। আবাদিদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতাম। হরিবাবুকে দেখতাম, তাঁর কয়েক টুকরো ধানখেতে হাঁটু মুড়ে বসে আগাছা ওপড়াচ্ছেন। নয় তো সুধন্যর সঙ্গে জাল নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছেন। কিছুকাল আমরা পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করতাম না। এভাবে প্রতিদিন প্রকৃতিতে থাকার ফলে আমার যেন একটা পরিবর্তন ঘটতে থাকে। শঙ্খিনী নদীর ধারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা খোলা ঘাসজমি ছিল। তার কেন্দ্রে একটি কাত-হয়ে-থাকা বয়স্ক হিজলগাছ। মাটির সমান্তরালে ছড়ানো একটি মোটা ডালে অনেকক্ষণ বসে থাকা অভ্যাস ছিল। একদিন বিকেলে হঠাৎ একটি বিস্ময়কর চেতনা আমাকে নাড়া দেয়। আরে, কী অবাক! এখানে খাজনা-আদায়কারী গোমস্তা নেই, পাইক-বরকন্দাজ নেই, আদালতের পেয়াদা নেই, পুলিশ নেই, রাজা-জমিদার নেই, বুজুর্গ পির বা ব্রাহ্মণেরা নেই, ধর্ম-সমাজ-সম্প্রদায় নেই, সরকারবাহাদুর নেই, রাষ্ট্র নেই! মানুষের কোনো নির্মাণই নেই। এখানে যা আছে, তা প্রকৃতিসৃষ্ট এবং স্বাভাবিক। এইসব উদ্ভিদ, পাখি, প্রজাপতি, শিশির, পোকামাকড়, চতুষ্পদ যাবতীয় প্রাণী কী অবাধ, স্বাধীনতাময়। এর কিছুদিন পরে দেবনারায়ণদা আমার চালচলনে অন্যমনস্কতা লক্ষ করার পর জেরা করে জেনে নিতে চাইতেন, কী ঘটেছে? তাঁকে প্রকৃতি সম্পর্কে আমার ওই ধারণার কথা বলায় তিনি হেসে ওঠেন। বলেন, শফি! মনে হচ্ছে, তুমি এতদিনে পরমা প্রকৃতির ব্রহ্মস্বরূপ

উপলব্ধি করেছ। তুমি সৃষ্টির অন্তর্বর্তী আনন্দধারার নিকটবর্তী হয়েছ। তবে সাবধান! তুমি আমেরিকান মনীষী হেনরি ডেভিড থরো-তে পরিণত হয়ো না। আমার আবাদে থরোর অসহযোগ আন্দোলনের প্রচারক হলে বিপত্তির কারণ ঘটবে। বছরে আমাকে সত্তর হাজার তিন শত ছিয়ানব্বুই টাকা নয় আনা তিন পাই খাজনা কালেকটরিকে আদায় দিতে হয়। জিগ্যেস করলাম, কেন থরোর কথা বলছেন? তখন দেবনারায়ণদা আমাকে একখানি বই এনে দিলেন। বইটি দিয়ে বললেন, ওয়াল্ডেন এবং ব্রহ্মপুর এক নয়। মানুষজনও পৃথক। তবু তুমি প্রকৃতির কথা বললে, সেইহেতু বইটি পড়ে দেখতে পার। আশা করি, ইংরাজি এতদিনে মোটামুটি রপ্ত করেছ। বইটির পাতা উলটেই একটি বাক্য চোখে পড়ল! চমকে উঠলাম। 'স্ট্রেনজ লিবার্টি!' সত্যই তাই। আমিও প্রকৃতিতে যাই এবং ফিরে আসি 'অদ্ভুত স্বাধীনতা' নিয়ে, সেই স্বাধীনতা প্রকৃতিরই অংশ! খুব মন দিয়ে বইখানি পড়তে শুরু করলাম। যেসব শব্দের মানে জানা নেই, অভিধান খুলে দেখে নিই।···

রূপান্তর ও জন্মান্তরবৃত্তান্ত

সে বছর ভালো বর্ষা হয় নি। 'আবাদ' অঞ্চল নীচু এবং কয়েকটি ছোট্ট নদীর অববাহিকা হওয়ায় মোটামুটি ফসলের আশা ছিল। এই নদীগুলির মধ্যে একমাত্র শঙ্খিনীকেই নদী বলা চলে। বাকিগুলি নিতান্ত সোঁতা। এ অঞ্চলে এগুলিকে 'খাগড়ি' বলা হয়। উলুশরার অনাবাদি তৃণভূমিতে এমন একটি খাগড়ি দেখেছিলাম এবং একজন আশ্চর্য শাদা মানুষ (আরও আশ্চর্য, তাকে এখনও জিন বলে বিশ্বাস হয়, কিংবা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী সূক্ষ্মতম সীমান্তে অভিজ্ঞতাটি ঘড়ির দোলকের মতো দোলে।) আমাদের পথ দেখিয়েছিল। কতকাল আগের কাহিনী বলে মনে হয়! সোঁতাগুলির কাছে গেলে স্বপ্নের মতো ফিরে আসে চৈত্রের একটি মেঘলা দুপুরবেলা। আরও আশ্চর্য কথা, 'আবাদে'র আরণ্য নিসর্গে যেন প্রত্যাশা করি শাদা কোনো জিনের! একদিন বিকেলে শঙ্খিনীর তীরে হিজলগাছের সেই ডালটিতে বসে একটি হ্রস্বাকার ইংরাজি বই পড়ার চেষ্টা করছি, সামান্য দূরে গাছপালার ভেতর দুটি লোককে দেখতে পেলাম। তারা ঘন ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। কৌতূহলী হয়ে ডাল থেকে নেমে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম হরিবাবু ওরফে হাজারিলাল কাঁধে কুড়ুল নিয়ে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে চাপা স্বরে কথা বলছেন। আমাকে দেখতে পেয়ে হরিবাবু ইশারায় কাছে ডাকলেন। এই সময় বাঁদিকে গাছপালার ফাঁকে নদীতে একটা নৌকা দেখতে পেলাম। নৌকায় কয়েকজন দাঁড়িমাঝিশ্রেণীর লোক এবং তাদের দুতিনজনের মাথায় লাল ফেট্টি বাঁধা। বুঝলাম ওরা পাইক এবং সশস্ত্র। কাছে গেলে হরিবাবু বললেন, শফি! ইনিই আমার বাবার নায়েবমশাই গোবিন্দরাম সিংহ। গোবিন্দবাবু চমকে উঠে বললেন, কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! নমস্কার! নমস্কার! আপনি মৌলাহাটের পিরবাবার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র? আপনার পিতাসাহেব আপনার জন্য—

দ্রুত বললাম, সেকথা নিষ্প্রয়োজন।

গোবিন্দবাবু একটু হেসে বললেন, এইমাত্র আপনার বৃত্তান্ত ছোটোবাবুর নিকট অবগত হলেম। আপনার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য আগ্রহ হচ্ছিল। পরমেশ্বরের কৃপায় এই সৌভাগ্য লাভ হল। আপনি মহাপুরুষের সন্তান।

অয় ফরোগে মাহে হুসন্ অজ্. রুএ রুখশানে শুমা
অব্. রু এ খুবি অজ্. চাহে জনখ্.দানে শুমা···

এই ফারসি বয়েৎ আবৃত্তি করলেন গোবিন্দবাবু। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে হরিবাবু বললেন, আমার পিতাবাহাদুরের সংসর্গে গোবিন্দদা ফারসিনবিশ হয়েছেন। অবশ্য পিতাবাহাদুরের ফারসিশিক্ষা আর মুসলমানি কালচারের পশ্চাতে বিষয়স্বার্থ আছে। মুর্শিদাবাদের নবাববাহাদুর-নামক রঙিন পুতুলটিকে নিয়ে ইংরাজের সঙ্গে তিনি সমকুশলতায় খেলা করেন। গোবিন্দদা, সুজাপুর মহল আশা করি আপনার মনিবমহাশয়ের এতদিনে কুক্ষিগত হয়েছে?

গোবিন্দবাবু ওঁর কথায় কান দিলেন না। আমার দিকে উজ্জ্বল, ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, পিরজাদা! আপনার অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী দেখে কবিবর হাফিজের এই বয়েৎটি আবৃত্তি করলাম। এই বয়েতে মুখশ্রীর প্রশংসা আছে।

আস্তে বললাম, আমি আরবি-ফারসি হরফ চিনি। অর্থ বুঝি না। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যেটুকু পড়েছিলাম, স্মরণ নেই। পরে আমি সংস্কৃত আর ইংরাজি পড়েছি।

হরিবাবু আমার কাঁধে একটি হাত রেখে বললেন, শফির মুসলমানি আর নেই। সে রীতিমতো হিন্দু—তবে 'বেক্ষজ্ঞানী'!

গোবিন্দবাবু জিগ্যেস করলেন, আপনি কি সত্যই ব্রাহ্ম হয়েছেন?

একটু চুপ করে থাকার পর বললাম, আমি ধর্ম মানি না।

হরিবাবু অট্টহাসি হাসলেন। নিঝুম বনভূমি কেঁপে উঠল। গোবিন্দবাবুর মুখ দেখে মনে হল, সে কথা বিশ্বাস করেন নি। বললেন, আপনি এভাবে পরিবারের সংশ্রব ত্যাগ করেছেন কেন, জানি না। হরিনারায়ণের এই অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজন আছে, জানি। পিরবাবা এবং মৌলাহাটের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছি, আপনার সেরূপ কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাঁদের ধারণা, পিরবাবার বৈরী কালোজিনেরা আপনাকে হত্যা করেছে। শফিসাহেব, আপনি যদি কারুর প্রতি অভিমানবশে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে থাকেন, তাও আপনার চিন্তার ত্রুটি। গোস্তাকি মাফ করবেন একথার জন্য। বেশ তো! আপনি যদি পরিবারের সংশ্রব থেকে দূরে থাকতে চান, থাকুন। কিন্তু জন্মদাতা ও জন্মদাত্রী পিতা-মাতাকে অন্তত একখানি পোস্টকার্ডে ডাকমারফত জানিয়ে দিন যে, আপনি জীবিত এবং নিরাপদ। ঠিকানা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি এ বান্দাকে আজ্ঞা করেন, আমিও খুশহালে পোস্টকার্ড লিখে পাঠাব।

দৃঢ় স্বরে বললাম, না।

হরিবাবু বললেন, গোবিন্দদা, দোহাই আপনার, শফির ব্যাপারে নাক নাই বা গলালেন? আর-একটা কথা, আপনি এভাবে আমার কাছে আর আসবেন না। আমাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবেন না আর। এখনও আমার জীবনের ব্রতপালন সম্পূর্ণ হয় নি।

গোবিন্দবাবুর মুখে দুঃখভাব ফুটে উঠল। আস্তে বললেন, হরিনারায়ণ! মায়াবশে আসি। তবে এবারকার আসার উদ্দেশ্য তোমার বোনের তাগিদে। সে তোমার জন্য এতই উদ্বিগ্ন যে আশঙ্কা হয়, দুর্বৃত্ত কালো জিনটি আবার তাকে না আক্রমণ করে। হরিনারায়ণ! মনুষ্যাত্মা দুর্বল হলে প্রেতশক্তি তাকে করায়ত্ত করে। মুসলমান মতে যা কালো জিন, খ্রীষ্টানিমতে তা স্যাটান, বৌদ্ধমতে তা মার, জরথুষ্ট্রীয় মতে তা আহিরমান এবং হিন্দুমতে তা অশুভ প্রেতশক্তি।

বুঝলাম, এই গোবিন্দরাম সিংহ মহাশয় সুপণ্ডিত ব্যক্তি। কথাগুলি বিমর্ষভাবে বলেই তিনি নৌকার দিকে অগ্রসর হলেন। তখন হরিনারায়ণ তাঁকে অনুসরণ করে বললেন, ঠিক আছে। আপনি মাঘমাসে ব্রহ্মপুর আশ্রমে ব্রাহ্মদিগের মাঘোৎসব উপলক্ষে রত্নময়ীকে নিয়ে আসুন। স্বাধীনবালা নামে আশ্রমে একটি মেয়ে আছে। সে কৌশলে রত্নময়ীকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবে।

গোবিন্দবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলেন, মাঘোৎসব কোন্ তারিখে?

আগামী ১১ই মাঘ।

গোবিন্দবাবু চলে গেলেন। নৌকাটি বাঁকের মুখে অদৃশ্য হলে হরিবাবু সশব্দে শ্বাস ছেড়ে আমার দিকে

তাকালেন। বললেন, আমি বিপ্লবব্রত গ্রহণ করেছি। 'আনন্দমঠ' আমার জীবনের আদর্শ। কিন্তু দেখো শফি, মানবহৃদয় কী দুর্বল উপাদানে গঠিত! আমার বোন রত্নময়ীর উন্মাদদশার কারণ আমিই জানি। ভূতেপ্রেত বাজে কথা। রত্নময়ীর মানসিক বৈকল্যের মূলে আমি। গোবিন্দদার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেছিলাম কেন জান কি? রত্নময়ীর শুভাশুভ জানবার জন্যই। তার সুস্থতার কারণ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, তোমার পিতা নন, আমি। হ্যাঁ, আমিই। আমি সুস্থশরীরে বেঁচে আছি জেনে রত্ন সুস্থ হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কথা বলতে-বলতে হরিবাবু সেই হিজলগাছটির কাছে এলেন। কুড়ুলখানি মাটিতে সজোরে বিদ্ধ করে রেখে একটু হাসলেন। বললেন, প্রায়ই তুমি এখানে এসে বসে থাক দেখেছি। পাছে কেউ সন্দেহ করে, তোমার কাছে তাই আসি না। তবে তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে। এই সুযোগে বলে নিই। তোমার হাতে ওখানি কী বই?

বললাম, ফরাসি পণ্ডিত ভোলটেয়ারের লেখা। দেবনারায়ণদা পড়তে বলেছেন।

বইখানি দেখার পর হরিবাবু বললেন, তুমি হিউমের বই অবশ্য পড়বে। তিনিও একজন সুবিজ্ঞ দার্শনিক। যাই হোক, সেই কথাটা বলি। এবৎসর দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বৃষ্টি হয় নি। আকালের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। সম্বাদ পেয়েছি বিহার মুল্লুকে ইতো-মধ্যেই ভয়াবহ আকাল শুরু হয়েছে। তুমি কি লক্ষ করেছ, দলে-দলে ওই মুল্লুক থেকে সাঁওতাল-মুণ্ডারা বাঙলায় চলে আসছে? এই আবাদেও কয়েকটি দল এসে জুটেছে, জান কি?

হ্যাঁ। দেবনারায়ণদার কাছে শুনেছি। উনিও খুব উদ্বিগ্ন।

তিরু হাড়াম নামে একজনের কাছে 'বীরসা মহারাজ' নামে একজন মুণ্ডাসর্দারের বিস্ময়কর কীর্তি-কলাপের কথা শুনলাম। সে নাকি শিক্ষিত লোক। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছিল। তার কারাদণ্ড হয়। সম্প্রতি সে রাঁচি শহরের জেল থেকে মুক্তিলাভ করে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, শুধু ইংরেজ নয়, দেশবাসী হিন্দুদের বিরুদ্ধেও তার ভীষণ আক্রোশ। আমাদের সে 'দিকু' বলে। একথার প্রকৃত অর্থ অসভ্য। বহু গ্রামে সে হানা দিয়েছে। আমার সন্দেহ হয়, দলে-দলে ওরা বাঙলায় আসছে, এই আবাদেও এসে জুটেছে, কোনো অসৎ উদ্দেশ্য আছে কি না।

সম্বাদপত্রে পড়েছি এসব কথা। লাইব্রেরিতে কয়েকটি ইংরেজি-বাঙলা সম্বাদপত্র আসে। হাসতে-হাসতে বললাম, সম্বাদপত্র মিথ্যাভাষী। কলিকাতার বাবুগণ স্বপ্নদর্শী।

হরিবাবুও হাসলেন। তুমি দেবনারায়ণবাবুর প্রতিধ্বনি করছ। তাঁর মতে, ব্রাহ্মদের সম্বাদপত্র ছাড়া অন্যগুলিন মতিচ্ছন্ন ও মরীচিকাদর্শন করে। এবার আমার মুখে কিছু প্রকৃত সম্বাদ শ্রবণ করো। গোবিন্দদার কাছে যা শুনলাম, মনে হল, ইংরেজ কলেকটরি বরাবরকার রক্তপায়ী জীবের মতন এবারও অজন্মার ওজর গ্রাহ্য করবে না। জমিদারদের চাপ দেবে এবং তারা কৃষকদিগের উপর জুলুম করে খাজনা আদায় করবে। এর পরিণাম মর্মান্তিক হতে পারে। শফি, প্রস্তুত হও।

কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, আবার কাকে হত্যা করতে হবে, দাদা?

হরিবাবু বললেন, এক নয়, একাধিক হত্যার প্রয়োজন হবে।

আমাকে নীরব দেখে একটু পরে হরিবাবু আস্তে বললেন, শফি, তুমি জন্মান্তরবাদ কী জান কি?

জানি। কেন একথা?

হতে পারে তোমার জন্ম মুসলমান মাতার গর্ভে, কিন্তু তুমি পূর্বজন্মে অবশ্য হিন্দু ছিলে!

সকৌতুকে বললাম, আপনি কি জানেন আমার দেহে মুসলমানদের পরমপুরুষ পয়গম্বরের কয়্যার রক্ত

আছে? আমরা সৈয়দ। আমার পিতামহ লখনউ শহরে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁর পিতা ছিলেন পেশোয়ার-বাসী। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। তাই আমাদের বংশগত নামের সঙ্গে আলখোরাসানি যুক্ত আছে। খোরাসান পারস্যদেশের অন্তর্গত।

আমাকে অবাক করে হরিদা বলে উঠলেন, শফি! শফি! তোমার দেহে তাহলে আর্যরক্তও আছে। তুমি মোক্ষমুলরের পুস্তক পাঠ করো। তুমি আর্য, আমিও আর্য। খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার অব্দ নাগাদ আর্যগণ ভারতে আগমন করেন। আর্যসভ্যতার কালে ইউরো-পীয়রা নরমাংসভোজী আদিম জাতি ছিল! আর্যদের অপৌরুষেয় গ্রন্থ বেদ এবং ঋষিদের বেদব্যাখ্যাই বেদান্ত। ব্রাহ্মগণ বেদান্তব্যাখ্যায় ভ্রান্ত। বেদমাতা গায়ত্রীই দশপ্রহরণধারিণী দুর্গারূপে প্রকাশমানা হন। তিনিই ভারতবর্ষ। শফি, বন্দেমাতরম ধ্বনিতে ভারতাত্মার স্পন্দন আছে।

এই উচ্ছ্বসিত বাক্যসমূহ হরিবাবুর মুখ থেকে নির্গত হওয়ার কথা কল্পনাও করি নি। হাঁ করে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ তিনি কুড়ুলখানি কাঁধে তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, হেই সুধনিয়া! হুঁয়া ক্যা করছিস বে?

ঘুরে দেখলাম, সুধন্য আর বাঁকা বাগদি সামান্য দূরে নদীর জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁকা লোকটিকে আমার পছন্দ হয় না। তাকে কোথায় যেন দেখেছি। ভগবানগোলায় মামুজির বাড়িতে যে ডাকাত-দলটিকে দেখেছিলাম, তাদের একজনের চেহারার সঙ্গে বাঁকার অত্যন্ত মিল। একটু খোঁজ নেওয়া দরকার।

সূর্য অস্তগামী। গাছপালার ফাঁক দিয়ে গোলাপি রোদ্দুর এসে পড়েছে এখানে। অন্যমনস্কভাবে ভোল-টেয়ার সাহেবের বইখানির পাতা ওলটালাম। এক-খানে দৃষ্টি আটকে গেল—কী আশ্চর্য!

'Is it not quite natural that all the metamor-phoses seen on earth led in the East, where everything has been imagined, to the notion that our souls pass from one body to ano-ther? A nearly imperceptible speck becomes a worm; this worm becomes a butterfly. An acorn is transformed into an oak, an egg into a bird. Water becomes cloud and thunder. Wood changes into fire and ashes. In short everything in nature appears to be metamorphosed...the idea of metem-psychosis is perhaps the most ancient dogma of the known universe, and it still reigns in a large part of India and China.'

এদিন থেকেই আমার মনে এক চাপা আলোড়ন শুরু হয়। যখনই স্বাধীনবালাকে দেখতে পাই, তীব্র ইচ্ছা জাগে, তাকে বলি যে পূর্বজন্মে আমি কী ছিলাম বলে তার ধারণা হয়? হরিবাবু আমার দেহে আর্য-রক্ত আবিষ্কার করেছেন, একথাও তাকে বলার ইচ্ছা হয়। কিন্তু তেজস্বিনী, মুখরা ওই যুবতীর প্রতি আমার বুঝি গোপন আতঙ্ক ছিল। তারক নরসুন্দর নামে একজন নাপিত সপ্তাহে দুদিন ব্রহ্মপুরে ক্ষৌর-কর্মে আসত। খালের ধারে বটতলায় সে আশ্রম-বাসীদের গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে দিত। প্রবীণদের মধ্যে দাড়িগোঁফ রাখার ফ্যাশন ছিল। মধ্যবয়সী বা আমার মতো নবীন যুবকরা গোঁফ রাখার পক্ষপাতী ছিল। আমি অবিকল পান্না পেশোয়ারির গোঁফের অনুকরণ করেছিলাম। তারকের চৌকো আয়নাটিতে নিজের মুখ দেখতে-দেখতে নিজেই মুগ্ধ হতাম। সত্যই আমি কবি হাফিজ-বর্ণিত মুখশ্রীর অধিকারী। কিন্তু ভোলটেয়ার মহোদয়ের সেই বাক্যগুলি পাঠের পর থেকে তারকের আয়নায় নিজের হিন্দুত্বের লক্ষণ খুঁজতাম। তারক সন্দিগ্ধভাবে জানতে চাইত, গোঁফের গড়নে কোনো হেরফের ঘটিয়ে ফেলেছে কিনা। মৃদু হেসে বলতাম, আচ্ছা নরসুন্দরদাদা, সত্যি করে বলো তো আমাকে দেখে কি তোমার হিন্দু বলে মনে হয়? তারক খুব রসিক লোক ছিল। বস্তুত এদেশে নর-

আপনারা জানেন কি, বঙ্গপ্রদেশের বহু মুসলিমকন্যা ভ্রাতা গিরিশচন্দ্রকে পিতা সম্বোধন করে চিঠি লেখেন? মুসলিম ভাইরা তাঁকে ভাই গিরিশচন্দ্র বলে সম্ভাষণ করেন। গিয়াসুদ্দিন সসম্ভ্রমে বললেন, গত বছর কলিকাতায় তাঁর দর্শনলাভ করে ধন্য হয়েছি। আফতাবুদ্দিন সম্প্রতি কলিকাতা গিয়েছেন। একখানি সম্বাদপত্র প্রকাশের অভিপ্রায় আছে। তাঁর পত্রে অবগত হলেম, গিরিশভাই অসুস্থ। এই সময় শাস্ত্রীমহোদয়ের চোখ পড়ায় আমাকে বললেন, শফি! তুমি চুপ করে আছ কেন? তুমি শুনলাম ইংরাজি-নবিশ হয়ে উঠেছ। আলোচ্য বিষয়ে তোমার কোনো প্রস্তাব থাকলে বলো। আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে আপনার কী মত? শাস্ত্রীমহোদয় যেমন, তেমনি সভাস্থ সকল প্রবীণই অট্টহাসি হেসে উঠলেন। দেবনারায়ণদা বললেন, জন্মান্তরবাদ অসিদ্ধ। জীবাত্মা মৃত্যুর পর পরমাত্মায় বিলীন হয়। হৃদয়নাথ বললেন, জন্মান্তরবাদ বৌদ্ধধর্ম থেকে হিন্দুধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। পরমাত্মা মহাসমুদ্রবৎ। যেরূপ মহাসমুদ্র থেকে মেঘের উদ্ভব এবং বারিবিন্দু বর্ষিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মাও পরমাত্মা থেকে উদ্ভূত হয়। বারিবিন্দু আবার মহাসমুদ্রে গমন করে। এই সৃষ্টিচক্র অনন্তকাল ধরে চলেছে। এবার বলো, ইউরোপীয় সাহেবগণের এবিষয়ে কী মত? আমি ভোলটেয়ারের বইখানির কথা তুলব ভাবলাম। কিন্তু কী লাভ? দেবনারায়ণদা বললেন, হঠাৎ তোমার মাথায় এই প্রশ্ন জাগার কারণ কী, শফি? অগত্যা বললাম, তারক নরসুন্দর বলে, আশ্রমের ভোজনশালার আনাচে-কানাচে যে কুকুরগুলান ঘুরঘুর করে, তারা তাকে দেখলেই ঘেউঘেউ করে কেন? তারা পূর্বজন্মে সকলেই তার মক্কেল ছিল। তারা ক্ষৌরকর্ম করতে চায়। আমার কথা শুনে সভায় আবার অট্টহাসি উঠল। তখন আমি ভাবলাম, তারকের প্রভাবে আমি সম্ভবত কিছুটা রসিক হতে পেরেছি। অথবা আমি বহুরের পর বছরের জমে-ওঠা বুকের ভেতরকার শীতলতা সহ্য করতে আর পারছি না বলেই পরিহাস-উন্মুখ হতে চাইছি? সেদিন বিকেলে একটি ঘটনা ঘটল। খালের ধারে বটগাছটার দিকে যাওয়ার সময় স্বাধীনবালার মায়ের মুখোমুখি হলাম। সুনয়নীর কুটিরের চারদিকে ফুল ও ফলের গাছ। সারাদিন ওঁকে ফুল-ফলের গাছের পরিচর্যারতা দেখতাম। তাঁর স্বামীর ঘাতকের মৃত্যুর পর কিন্তু তিনি এতদিনে একবারও আমাকে অন্তত আভাসেও জানতে দেন নি, তাঁর কী প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। স্বাধীনকেও এবিষয়ে কোনো প্রশ্ন করি নি। এদিন সুনয়নী মৃদুস্বরে আমাকে ডাকলেন, বাবা! শোনো। কাছে গিয়ে কী হল, প্রণামের জন্য নত হলাম। অমনি তিনি যেন সসংকোচে কয়েক পা পিছিয়ে গেলেন। থাক্ বাবা, থাক্। আশীর্বাদ করি, দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করো। তোমাকে গোপনে একটা কথা বলতে চাই বলেই ডাকলাম। আস্তে বললাম, বলুন! সুনয়নী চারপাশ দেখে নিয়ে চাপা-স্বরে বললেন, কাউকে যেন বোলো না বাবা! তুমি মুসলমানের ছেলে বলেই বলতে সাহস পাচ্ছি। এখানে আমার মন তিষ্ঠোতে পারছে না। ছত্রিশ জেতের লোক একসঙ্গে খাচ্ছে-দাচ্ছে। বাবা, আমি হিন্দুর মেয়ে। আমার এসব মেলেচ্ছ আচার সহ্য হচ্ছে না। এখানে আর কিছুদিন থাকলে আমি মরে যাব। আমি জানি, তুমি বাবামায়ের ওপর রাগ করে এখানে আশ্রয় নিয়েছ। তুমি মুসলমান। তুমিও এখানে বেশিদিন থাকবে না—থাকতে পারবে না। তাই তোমাকেই বলছি। সুনয়নী চুপ করলেন। আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে বললেন, আমার আরও চিন্তা খুকুর জন্য। সে এখানে এসে যেমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে, ভয় হয়, সে নষ্ট হয়ে যাবে। বাবা শফি, তুমি যদি রেতের বেলা দোপুকুরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এস আমাদের, আমরা বহরমপুরে ফিরে যেতে পারব। দোপুকুরিয়ার খুকুর বাবার এক জ্ঞাতি আছেন শুনেছি। নাম জানি না। সে আমরা খুঁজে বের করে নেব। সুনয়নীর এই কথা শুনছিলাম আর তাঁর কুটির

সুন্দরদের রসিকতা প্রথাসিদ্ধ এবং যত স্থূল হোক না কেন, তারা সুযোগ পেলেই রসিকতা করবে। তা ছাড়া বহু লোক অথবা পরিবারের গোপন কেলেঙ্কারির তথ্য তার জানা থাকবেই। গালে জল ঘষতে-ঘষতে বা ক্ষুরটিকে চামড়ার ফালিতে শান দিতে-দিতে পছন্দসই মক্কেলকে সে সেই তথ্য পাচার করবেই। তো আমার কথায় তারক মুচকি হেসে বলত, মিয়া-সাহেব! আপনি 'বড়খাসি' মাংস খাওয়া ছেড়েছেন বলেই আপনার রূপ খুলেছে। হ্যাঁ, কোন্ গুখেকোর বেটা বলে আপনি মোচলমান? 'বড়খাসি' কথাটি গোরুর প্রতিশব্দ। একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এই নরসুন্দর বা হিন্দু নাপিতরা ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-সদ্গোপ-গোপ প্রমুখ জাতির ক্ষৌরকর্ম যেমন করে, তেমনি মুসলমানদের ক্ষৌরকর্মেও তাদের আপত্তি নেই। এজন্য বার্ষিক কিছু ধান পায়। কিন্তু তারা কদাচ বাগদি কুনাই-কুড়র-হাড়ি-মুচি-ডোম প্রমুখ নিম্নবর্গীয়দের ক্ষৌরকর্ম করবে না। আবাদের নিম্নবর্গীয়দের জন্য হিন্দুস্তানি এক নাপিত বা হাজাম আসে। তার নাম ফাগুলাল। তার বাড়ি নুরপুরের চটিতে (ছোট্ট বাজার)। ফাগুলাল হাজাম আবাদ এলাকায় ঢুকলে হুলুস্থুল পড়ে যায় দেখেছি। সে কেশবপল্লীর কাছে একটি প্রকাণ্ড গাবগাছের তলায় গম্ভীর মুখে বসে। হিন্দুস্তানি হাজামদের সঙ্গে বাঙালি হাজামদের আমূল ফারাক। ফাগুলালরা রসিক নয়, ভাঁড়ামি জানে না। একদিন দেবনারায়ণদার ঘরে কথাপ্রসঙ্গে আমি এই বৈসাদৃশ্যের কথা তুললে উনি খুব হাসলেন। বললেন, তুমি ঠিকই লক্ষ করেছ। তোমার পর্যবেক্ষণশক্তি অসামান্য। এ বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন আছে। ওইসময় বাঁকিপুরের ব্রাহ্মভ্রাতা গিয়াসুদ্দিনও উপস্থিত ছিলেন। নুরপুরের ধর্মসমন্বয়বাদী মৌলবি আফতাবুদ্দিন তাঁর আত্মীয় ছিলেন। গিয়াসুদ্দিন বললেন, আরেকটি আশ্চর্য ব্যাপারে আমার চিন্তা হয়। সারা ভারতবর্ষ পানি বলে, শুধু বাঙালি হিন্দুরা জল বলেন। দেবনারায়ণদা অভ্যাসমতো বললেন, না গিয়াসভাই, দাক্ষিণাত্য বলে না। দেবনারায়ণদা বললেন, বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণাঞ্চল একদা অনার্য-অধ্যুষিত ছিল। রামায়ণে সে বৃত্তান্ত আছে। ওখানকার ভাষা আর্যভাষা নয়। গিয়াসভাই ঠিক বলেছেন। আর্যভাষাভাষীরা সমুদায় পানিই বলে। আমরা শুধু জল বলি। শাস্ত্রীমহোদয় বললেন, অবশ্য পানি সংস্কৃত মূল থেকে উৎপন্ন। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু চিন্তা আছে। সবাই একগলায় বললেন, বলুন, বলুন। শাস্ত্রীমহোদয় বললেন, আমার দেশভ্রমণের বাতিক আছে। উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করেছি। তবে আর্যাবর্তে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি। ধর্মব্রতী অংশ বাদে সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক ঐক্য বিদ্যমান। পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, এমন কি হিন্দু আর মুসলমানের নামেও ঐক্য সুপ্রচলিত। কিন্তু বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও বিস্তর অনৈক্য। এই এদেশ ছাড়া কুত্রাপি মুসলমানদের যবন অথবা নেড়ে বলা হয় না। এ প্রদেশে আরও প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। গিয়াসুদ্দিনও পণ্ডিত ব্যক্তি। একটু হেসে বললেন, ইতিহাসবহির মর্মানুসারে সিদ্ধান্ত হয়, ব্রাহ্মণ্যধর্মের চাপে বৌদ্ধরা আর্যাবর্ত থেকে পূর্বখণ্ডে চলে আসেন। তাঁরা ছিলেন মুণ্ডিতমস্তক। এতৎপ্রদেশেও ব্রাহ্মণ্যপ্রকোপে তাঁরা মুসলমান হন। সেজন্য সমূহ মুসলমান-সম্প্রদায়কে 'নেড়ে' বলা স্বাভাবিক। দেবনারায়ণদা তাঁর উদাত্ত হাসি হেসে বললেন, ব্রাহ্মভ্রাতা গিরিশচন্দ্র সেনকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় পবিত্র কোরানগ্রন্থ বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদের নির্দেশ দেন। একযুগ পূর্বে তিনি নিজে লখনউ থেকে আরবিভাষা শিখে মহৎ কর্মটি সুসম্পন্ন করেছেন। এতে আনন্দিত মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ তাঁকে মৌলবি খেতাব দিয়েছেন। কিন্তু পৌত্তলিক হিন্দুদিগের নেতৃবৃন্দ চটে আগুন। তারা গিরিশবাবুকে যবন, নেড়ে ইত্যাদি গালি দিচ্ছে। তাতে দুঃখ নেই। শুধু দুঃখ যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র অনুবাদ সমাপ্ত দেখে যেতে পারেন নি।

ও ফুল-ফলের গাছগুলি দেখছিলাম। খুব বিস্ময় বোধ হচ্ছিল। বললাম, স্বাধীন কী বলে? সুনয়নী বললেন, ওকে বলব দোপুকুরিয়ায় ওর কাকার বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি। আসলে আমি স্ত্রীলোক, সঙ্গে উঠন্তবয়সী মেয়ে, রাতবিরেতে যাওয়ার সাহস নেই। সঙ্গে একজন শক্তসমর্থ পুরুষমানুষ থাকা দরকার। খুকুর কাছে শুনেছি, তুমি খুব ডানপিটে ছেলে। লাঠিখেলা তরোয়ালখেলা জান। কোন্ গুণ্ডাকে তুমি নাকি মেরে নাকাল করেছ। আরও শুনেছি, তোমার সঙ্গে খুকুর বাবার খুব চেনাজানা ছিল। একটু হেসে বললাম, ছিল। যামিনীবাবু আমাকে তাঁর বিপ্লবী দলে টানতে চেয়েছিলেন। এতক্ষণে সুনয়নী আমার খুব কাছে এলেন। ফিসফিস করে বললেন, জানি। খুকু বলেছে, তুমি মুসলমান হলেও বন্দেমাতরমদলের লোক। তোমার কাছে নাকি খুকুর বাবার মতন পিস্তলও আছে। স্বাধীনবালার মায়ের এই কথায় চমকে উঠলাম। ভাবলাম, এতসব বলেছে স্বাধীন, কিন্তু কেন বলে নি যে আমি স্ট্যানলিকে খুন করেছি? বললাম, আপনি তো ইচ্ছে করলে দিনেই দেবনারায়ণবাবুকে বলে দোপুকুরিয়া চলে যেতে পারেন! আত্মীয়বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছি বললে তিনি বাধা দেবেন কেন? বরং পালকির ব্যবস্থা করেও দেবেন। সুনয়নী ঝাঁঝালো স্বরে বললেন, বলেছিলাম। উনি ঠাট্টা করে বললেন, তুমি 'বেহ্ম' হয়েছ। কেউ তোমাকে নেবে না। বাড়ি ঢুকতে দেবে না। আসলে আমি বুঝতে পেরেছি, খুকুকে উনি কাজে লাগিয়েছেন। ছোটোলোকদের মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য খুকুর মতন মেয়ে আর পাবেন কোথায়? তাই ওকে আটকে রাখতে চান। বাবা শফি, তোমাদের আল্লাপির-ভগবানের দোহাই, আমাকে মা বলে জেনো—যেন এসব কথা কারুর কানে যায় না।

আপনাকে কাল একসময় বলব। বলে খালের দিকে না গিয়ে বাঁধের পথে উঠলাম। তারপর মনে হল, আমি কি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছিলাম? কেশবপল্লীতে হাজারিলালের কুটিরের দিকে অন্যমনস্কভাবে হেঁটে চললাম। কুটিরের কাছাকাছি পৌঁছে বাঁধের ডানদিকে নীচের আবাদি জমির একধারে একটি গাছের দিকে দৃষ্টি গেল। সেখানে উজ্জ্বল রোদ পড়েছিল। হাজারিলাল একটা কোদালের বাঁটে বসে আছেন এবং তাঁর মুখোমুখি বসে আছে স্বাধীনবালা। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় মারল কেউ। দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালাম। কেউ তো নেই! অথচ শরীরে কোথাও চপেটাঘাতের জ্বালা। শিউরে উঠলাম।···

'Angelos Satan me colaphiset !'

ওই অলৌকিক থাপ্পড়টি আমার পিতার প্রেরিত কোনো জিনের; এই ধারণার পিছনে পূর্বসংস্কারের তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণ অনস্বীকার্য। সত্যি বলতে কী, বেশ কিছুদিন আমি খুব ভীত আর আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। ওই কয়েক দণ্ডের জন্য আমি নিতান্ত অবোধ বালকে পরিণত হয়েছিলাম যেন। তাহলে কি সত্যিই পিতার প্রেরিত জিনেরা নিরন্তর আমার পাহারায় রত? একজন হিন্দুকন্যার প্রণয়াসক্ত যাতে না হই, যাতে তজ্জনিত ঈর্ষায় আক্রান্ত না হই, সেই কারণে আমাকে সতর্ক করা হল! আমার বৃদ্ধ পিতা অবশ্যই জানেন আমি কোথায় আছি। পান্না পেশোয়ারিকে আঘাত করা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমি অত্যন্ত নিরাপদ। এর একটাই ব্যাখ্যা হয়। লালবাগ শহর থেকে এক জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় পালিয়ে আসার মুহূর্ত থেকে পিতা তাঁর অনুগত জিনের মারফত আমার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। অতএব, আমি তাঁর অনভিপ্রেত কাজ করব না। ঠিক করলাম, স্বাধীনবালাকে ঘৃণা করতে থাকব। তার দিকে চোখ তুলে চাইব না। এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে বাঁধ ধরে এগিয়ে বাঁদিকে নেমে শঙ্খিনীর ধারে সেই হিজলগাছটার কাছে যাবার উপক্রম করছি, পিছনে 'হাজারিলালের' চিৎকার শুনতে পেলাম,

শফিসাব! ঠারিয়ে! ঠারিয়ে! ঘুরে দাঁড়ালাম। 'হাজারিলাল' ফের চেঁচিয়ে বললেন, থোড়াসা বাত আছে আপনার সোঙ্গে। দেখলাম, ওরা দুজনেই হেমন্তের হলুদধানখেতের আল দিয়ে জোরে হেঁটে আসছে। কাছে আসার পর প্রথমে স্বাধীনবালাই কথা বলল। শফিদা! দুপুরে তুমি কোথায় ছিলে? দেবুজ্যাঠা আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দিলেন—দেখো না, কী ঝামেলা! তার হাতে কিছু কাগজ আর একটি পেনসিল ছিল। তার দিকে না তাকিয়ে বললাম, কী ঝামেলা? জবাব দিলেন হরিবাবু। বাঁকা হেসে বললেন, দেবেন্দ্রপল্লীতে স্ত্রীলোক-গণনা। কেউ দেবনারায়ণবাবুর কানে তুলেছে, দেবেন্দ্রপল্লীর স্ত্রীলোকেরা নাকি মূর্তিপূজা করে। তাই ব্রহ্মমন্দিরের সান্ধ্য উপাসনায় তাদের উপস্থিতি বিরল। হাসবার চেষ্টা করে বললাম, দেবনারায়ণদা কি এবার হাজিরা খাতা খুলবেন নাকি? হরিবাবু বললেন, বড়োলোকের নবাবি খুশখেয়াল। খুলবেন বলেই মনে হচ্ছে। স্বাধীনবালা বলল, নাম লিখতে গিয়ে হাজার কৈফতের ঠ্যালায় অস্থির। চাষাভুষো লোক ওরা। ভাবল, খাজনার অঙ্ক বাড়বে। বলে আমার দিকে তাকিয়ে চোখে ঝিলিক তুলল। বলল, কাল তোমাকে নতুন-পল্লীতে পাঠাবেন—ওই যে দেখছ, সাঁওতালদের বসতি, ওখানে। না—ভয় পেয়ো না! ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে নয়, লোকগণনায়। এই সময় হরিবাবু চাপা স্বরে বললেন, শফি! আগামীকাল সন্ধ্যায় তুমি কোনোপ্রকারে আমার কুটিরে আসবে? বিশেষ প্রয়োজন। বললাম, আসব। বলে বাঁধ থেকে নামতে যাচ্ছি, স্বাধীনবালা বলল, শফিদা, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? চলো, আমাকে আশ্রমে পৌঁছে দেবে। বললাম, কেন? এখনও তো সন্ধ্যা হয় নি। হরিবাবু বললেন, আমিই যেতাম—যেতে হত। বিজয়পল্লীতে ইদানীং কিছু অবাঞ্ছিত লোক উপদ্রব করছে। তারা নেশাভাং করে এসময় উন্মত্ত থাকে। দেবনারায়ণবাবু জানেন। কিন্তু বাঁকা সর্দার নামে বিজয়পল্লীর যে মোড়লটি জুটেছে, সে ওঁর স্নেহধন্য। জমিদারি রক্ত, শফি! সকলে তো আমার মতো সংস্কারবর্জন করতে পারে না। বাঁকা কুখ্যাত ডাকাত ছিল। পরে সে লাঠিয়ালি পেশা গ্রহণ করে। দেবনারায়ণবাবুর দক্ষিণ হস্ত সে। জানি না, লোকটির আমার হাতে মৃত্যু আছে কি না। স্বাধীনবালা বলল, চুপ করো, হরিদা! সর্বত্র বীরত্ব দেখানো ঠিক নয়। শফিদা, বিজয়পল্লী বা বাঁকা-টাঁকার জন্য নয়,—সে একটু হাসল—ইদানীং আমার ভূতের বড়ো ভয়। হরিবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, স্ট্যানলির ভূত! স্বাধীনবালা বলল, চুপ করো! শফিদা, লক্ষ্মিটি! আশ্চর্য, যখন ওর সঙ্গে পা বাড়ালাম, নিজের থাপ্পড় খাওয়ার অস্বস্তিকর জ্বালাটি আর নেই। আর সেই মুহূর্তে ঘৃণা করার ইচ্ছাটিও ঘুচে গেল। চারদিকে কুয়াশার সঞ্চার। গাছে-গাছে পাখিরা তুমুল কলরব করছে। ইতস্তত পল্লীগুলিতে শান্ত নীরবতা এবং শঙ্খধ্বনি। ডাকলাম, খুকু! স্বাধীনবালা প্রচণ্ড চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। বলল, আমার ডাকনাম তোমাকে কে বলল? বললাম, তোমার মা। স্বাধীনবালা চুপ করে গেল। তখন বললাম, খুকু! তোমার মা আমাকে আল্লাপির-ভগবানের দোহাই দিয়ে কথাটি বলতে নিষেধ করেছেন কাউকে। কিন্তু আমি ধর্ম মানি না। তাছাড়া কথাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনবালা থমকে দাঁড়িয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, কী কথা শফিদা? একটু ইতস্তত করে বললাম, তুমি শিক্ষিতা। বুদ্ধিমতী। কলহ না করে মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিও। তবে কথাটি গোপন না রেখে তোমাকে বলার কারণ—আমি থেমে গেলে স্বাধীনবালা বলল, কী? চুপ করে থেকো না। আমি নির্বোধের হাসি হেসে বললাম, হরিবাবু তোমার জন্য কষ্ট পাবেন ভেবেই কথাটি বলা দরকার। স্বাধীনবালা আবার চমকে উঠল। আবছা আলোয় তার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত এবং চোখে ছটা দেখতে পেলাম। কিন্তু হঠকারী তাড়নায় আমিও উত্তেজিত। সুনয়নীর সঙ্গে আমার কথাবার্তা দ্রুত এবং সংক্ষেপে ওকে জানিয়ে দিলাম। স্বাধীনবালার প্রতিক্রিয়া ম্লান হাসিতে প্রকাশ পেল মাত্র। শ্বাস ছেড়ে সে বলল, আমি জানি। মায়ের এখানে থাকতে কষ্ট হয়। মানিয়ে চলতে পারে না। তবে এ কোনো নতুন

কথা নয়। মা আমাকে বহুবার বলেছে, চল্, আমরা এখান থেকে চলে যাই। কিন্তু মা বুঝতে পারছে না, কোথায় গিয়ে উঠবে? কী খেয়ে বেঁচে থাকবে? বহরমপুরে—তুমি জান না—আমরা পরাশ্রিতা ছিলাম। আমিই দেবুজ্যাঠাকে চিঠি লিখি। তখন উনি আমাদের নিয়ে আসেন। সে এতক্ষণে পা বাড়াল। খুব নিস্তেজ তার গতি। একটু পরে ফের বলল, তবে তুমি হরিদা আর আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ কর তা ভুল। আমি হরিদাকে শ্রদ্ধা করি। তার দেশের জন্য আত্মত্যাগ এবং কষ্টস্বীকারের মধ্যে বাবাকে দেখতে পাই। স্বাধীনবালার কণ্ঠস্বর শুনে দুঃখিতভাবে বললাম, তুমি কি কাঁদছ, খুকু? আমাকে ক্ষমা করো। আমার চোখে পাপ আছে। মুসলমান শাস্ত্রে পাপকে শয়তানের ক্রিয়াকলাপ বলা হয়। খুকু, কিছুক্ষণ আগে আমি যখন তোমাদের একত্র বসে থাকতে দেখি, তখন একটি অদৃশ্য হাতের থাপ্পড় খেয়েছিলাম, জান কি? স্বাধীনবালা কোনো কথা বলল না। বললাম, থাপ্পড়টি জিনের ভেবেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, শয়তান আমাকে থাপ্পড় মেরেছিল। মনীষী ভোলটেয়ারের দর্শনগ্রন্থে পড়েছি, বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, সেন্ট্ পলকে শয়তান একবার চপেটাঘাত করেছিল। Angelos Satan me colaphiset! স্বাধীনবালা সন্ধ্যার অন্ধকারে আমার বাঁ হাতটি ধরে বলল, শফিদা! আমাকে ভুল বুঝো না! তার হাতের স্পর্শে আমার হাত মুহূর্তে নিঃসাড় হয়ে গেল। পরক্ষণে সে হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, তোমার প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব। তবে একটা কথা তোমাকে জানানো উচিত। আমাকে ঈশ্বর অনেক কিছু দান করেছেন। একটি জিনিস বাদে। সে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকলে আস্তে বললাম, সেটি কী খুকু? স্বাধীনবালা ফের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, পুরুষের প্রতি প্রেম। শফিদা, এ জীবনে কোনো পুরুষ মাথা ভেঙেও এই জিনিসটি আমার কাছে পাবে না। দ্রুত বললাম, কেন? স্বাধীনবালা এ প্রশ্নের জবাব দিল না। চলার গতি বাড়িয়ে দিল। আশ্রম পর্যন্ত আর একটি কথাও বলল না। তখন মন্দিরে আসর বসেছে। বেদীতে বসে দেবনারায়ণদা উদাত্তস্বরে উপনিষদ পাঠ করছেন। বহুশ্রুত কঠোপনিষদের একটি শ্লোকের সঙ্গীতময় ধ্বনিযুক্ত ভেসে এল কানে :

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ···

পরদিন সকালে গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে একজন মুসলমান যুবক আশ্রমে এলেন। গিয়াসুদ্দিন আমাকে দেখিয়ে তাঁকে সহাস্যে বলে উঠলেন, এই সেই পলাতক পিরজাদা। শফি! এঁর নাম দিদারুল আলম। নুর-পুরে নিবাস। তবে বহরমপুর শহরে ওকালতি করেন। আমার আত্মীয়। দিদারুল হাত বাড়িয়ে বললেন, আস্সালামু আলায়কুম! বহুকাল পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রত্যুত্তর দিলাম এবং আমার কণ্ঠস্বরে আড়ষ্টতা ছিল। দিদারুল গম্ভীর মুখে বললেন, আপনার আব্বাসাহেব আমাদের গ্রামে এসেছেন জানেন কি? বললাম, না। দিদারুল বললেন, আপনার কথা গিয়াসভাইয়ের কাছে শোনামাত্র ছুটে এসেছি। একটু আড়ালে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। গিয়াসুদ্দিন বললেন, আমি দেবুভাইয়ের কাছে গিয়ে বসছি। তোমরা কথা বলো। দিদারুল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, চলুন। ওই খালের ধারে যাই। আকস্মিকতার ধাক্কা ততক্ষণে কাটিয়ে উঠেছি। শক্ত মনে খালের ধারে একটি জামগাছের তলায় গেলাম। দিদারুলের পরনে আচকান, মাথায় লাল তুর্কি টুপি, গোড়ালির উর্ধ্বে পায়জামা দেখে বুঝলাম এই নবীন উকিল ফরাজি। তিনি বিনা ভূমিকায় ভর্ৎসনার সুরে বললেন, আপনি সৈয়দবংশীয়। আপনার আব্বা বুজুর্গ আলেম। অথচ আপনি এই হিন্দুদিগের আশ্রমে হিন্দু লেবাস (পোশাক) পরে হিন্দুর চেহারা নিয়ে বাস করছেন! তওবা, আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ্! এ আপনি কী করছেন? যারা হিন্দুস্তানে সাতশো বছরের মুসলমান তহ্‌জিব-তমুদ্দুনকে নাকচ করে খ্রীষ্টানশ্যাহির মদতে বেদ-রামায়ণ-মহাভারতের দিকে মুখ ফিরিয়েছে, আপনি তাঁদের কদমে কদম মিলিয়েছেন ভাই? আপনি নাকি প্রচুর কেতাব পাঠ করেন। আপনি বুঝতে পারছেন না—ডোণ্ট আনডারস্ট্যানড দ্যাট দা হিন্দুজ আর ডেলিবারেটলি ট্রাইং টু মিসলীড দেয়ার নিউ জেনারেশন? দে আর মিস্‌ইনটারপ্রিটিং দা হিস্ট্রি! এডুকেশনাল কারিকুলাম পর্যন্ত অভিসন্ধিপ্রণোদিত! আপনি ব্রাহ্মদিগের লিবার‍্যাল অ্যাটিচ্যুডের কথা বলতে পারেন। রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মদিগের লাইন চেঞ্জ হয়ে গেছে। বিস্তর দলাদলি চলেছে তাঁদের মধ্যে। কিন্তু একটা বিষয়ে সকলের এক রা। হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবন। যা কিছু মুসলমানের, তা পরিত্যাজ্য। বাঙ্গালা ভাষা থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে আরবি-ফার্সি-তুর্কি বর্জন চলেছে। সংস্কৃতের আধিপত্য—দিদারুলকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, আপনিও কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করছেন! দিদারুল হাসলেন। বললেন, অভ্যাস। বলেই শব্দটি বদলালেন, খাসিয়ৎ! তবে আমি একথা মানি না যে বাঙালি মুসলমানের জবান হবে উরদু। যাই হোক, ভাই শফিউজ্জামান! আপনি সৈয়দ। আপনার দেহে পাক খুন বইছে। আপনাকে আমাদের সমাজের খুবই প্রয়োজন। আপনাকে আমি নিতে এসেছি। এখনই আমার সঙ্গে নুরপুরে চলুন। আপনার আব্বাসাহেবের কদম-মোবারকে (পবিত্র পদে) হাজের হলেই শয়তান আপনার সঙ্গ ছেড়ে ভেগে যাবে। দিদারুল হাসতে থাকলেন। আমার ইচ্ছা করল, এই উকিলটিকে স্ট্যানলির পিস্তল-দ্বারা হত্যা করি। কিন্তু পিস্তলটি আমার ঘরে লুকানো আছে। আমি চুপ করে আছি দেখে দিদারুল আমার একটা হাত ধরে টানলেন। অমনি হাত এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, আপনি এখনই আশ্রম ছেড়ে চলে যান। যদি না যান, বিপদে পড়বেন। দিদারুল স্তম্ভিত হয়ে বললেন, সে কী কথা! বললাম, আপনি যদি গিয়াসসাহেবের সঙ্গে না আসতেন, আপনাকে—আমি থেমে গেলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, সৈয়দজাদা! এখনও হিন্দুস্তানে মুসলমান তত কমজোর হয়ে পড়েনি! আপনার আব্বাসাহেবকে খবর দিলে তমাম এলাকার মুসলমান এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার ইচ্ছা নয়, আপনার ওপর জবরদস্তি করি। আপনি আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করুন। আপনি কি ভেবেছেন, হিন্দুরা আপনাকে আপন বলে গ্রহণ করবে কোনোদিন? সৈয়দজাদা! এ আপনার আকাশ-কুসুম খোয়াব। হিন্দুদিগের আপনি চেনেন না। যারা নিজেদের মধ্যে একজাতি অপরজাতিকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, তারা মুসলমানকে ভেতর-ভেতর কী চোখে দেখে, নিজেই ভেবে দেখুন। এবার আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। দ্রুত স্থানত্যাগ করলাম। দিদারুল গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমি প্রায় শুকিয়ে-পড়া খালটি এক লাফে ডিঙিয়ে মাঠে গিয়ে পড়লাম। তারপর হলুদ এবং ভুলুণ্ঠিত পাকা ধানখেতের ভেতর দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতন হাঁটতে থাকলাম। তখনও রাতের শিশির শুকোয় নি। হাঁটু পর্যন্ত ভিজে গেল। কোথায় সামান্য জলকাদা, কোথাও ঝোপজঙ্গল। সবখানে মাকড়সার জালে শিশিরবিন্দুগুলিন ঝলমল করছিল। শঙ্খিনীর তীরে সেই হিজলগাছটির কাছে পৌঁছে মনে হল, আমি নিরাপদ। আঃ! কী রাজার ঐশ্বর্য চতুর্দিকে দীপ্যমান! কী রহস্য ওই অরণ্যের বুকে ঘননীলবর্ণ কুয়াশায়! কোথায় পাখি ডাকল। এই তো সেই পবিত্র ভূমি—যেখানে পৌঁছুলেই মনে হয়, কেউ একজন আছে, যে চিরকালের নারী, যার জন্য পুরুষদিগের জন্ম, যাকে লক্ষ্য করে সমুদয় কবিগণ কবিতা রচনা করেন, 'whose heart-strings are a lute'! শঙ্খিনী নদীর জলে পা ধুয়ে এসে মাটির সমান্তরাল হিজল ডালটিতে বসামাত্র মনে হল, কী আশ্চর্য! এই তো আমার রাজত্ব। কার সাধ্য আমাকে এখান থেকে স্থানচ্যুত করতে পারে?

I am monarch of all I survey,
My right there is none to dispute...
(William Cowper (1731—1800))

(ক্রমশ

বিভাগোত্তর পশ্চিমবাঙলায় বাঙালি মুসলমানের চিন্তাচেতনার গতিপ্রকৃতি

আবদুর রউফ

কোনো-কোনো মানবগোষ্ঠীর জীবনে এক-একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ে দীর্ঘদিনব্যাপী এমন এক অবস্থার উদ্ভব হয় যখন তাদের জীবনেতিহাস খুঁজলে প্রাণ-ধারণের আর দিনযাপনের গ্লানি ছাড়া উল্লেখ করার মতো আর বিশেষ কোনো গৌরবের জিনিস খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যা কিছু পাওয়া যায়, বিচার করলে দেখা যায় সেসবের মধ্যেই তাদের দুর্দশার কাহিনীই পরিস্ফুট। এরই নাম অন্ধকারময় যুগ। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের বাঙালি মুসলমানের জীবনে ঘনিয়ে আসে এমনই এক তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়। স্বাধীনতার উনচল্লিশ বছর অতি-বাহিত হয়ে যাবার পর আজও এই অধ্যায়ের পরি-সমাপ্তি ঘটেছে, এমন দাবি করা যায় না।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে কলকাতাকে কেন্দ্র করে যেসব বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজের অগ্রগণ্য অংশ হিসাবে পরিগণিত হতেন, দেশভাগ হওয়ার দু-তিন বছরের মধ্যে তাঁদের প্রায় সবাই সীমান্তের ওপারে প্রস্থান করেন। যে গুটিকতক পুরোগামী মানুষ কিছুতেই পাকিস্তানকে স্বদেশ করে নিতে রাজি হলেন না, তাদের অন্যতম হলেন কাজী আবদুল ওদুদ, যাঁর অন্যতম পরিচয় কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'এদেশে হিন্দুমুসলমান-বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পাই না, তখন মাঝে মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন করে আছে এমন এক-একটি সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য সেই মিলনের প্রশস্ত পথ রূপে আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে, তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি তাঁর পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাংলাভাষায় তাঁর প্রকাশশক্তির বিশিষ্টতা।' এক-কালে ঢাকার বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম হোতা এই জ্ঞানতপস্বীর এপার-বাঙলায় অবস্থানের গুরুত্ব যে কতখানি তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের এই সশ্রদ্ধ উক্তি

থেকেই অনুধাবন করা যায়। অথচ যদিও এই শতকের সত্তরের দশক পর্যন্ত জীবিত থেকে তিনি নিরন্তর মনন-শীলতার চর্চায় ব্যাপৃত ছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে প্রকৃত মর্যাদা দেয়ার মতো বাঙালি মুসলমানের সংখ্যা এপার বাংলায় কখনই তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে চোখ পড়ে নি। বাস্তবিক, দেশভাগের পর এখানকার মুসলমান-দের ভাবগত রিক্ততার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। প্রয়াত আবু সয়ীদ আইয়ুব অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল এই বাঙলায় বসবাস করে তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সূক্ষ্ম নান্দনিক বীক্ষণ দিয়ে বাঙালি মনন তথা বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন; কিন্তু আজো খুব সামান্যসংখ্যক মুসলমানই এসবের প্রতি আগ্রহ পোষণ করেন। চিত্তবৃত্তির এই রিক্ততার সূত্রানুসন্ধানের প্রতি আগ্রহ এখনও সম্প্রদায়বহির্ভূতদের মধ্যেই বেশি, সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে আত্মদর্শনের অভীপ্সা খুবই ক্ষীণ এবং মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কাজী আবদুল ওদুদ একসময় এই দেশের বাঙালি মুসলমানদের পরিচয় দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন, প্রাক-ব্রিটিশ যুগে বঙ্গভূমিতে সুফী সাধকদের প্রাধান্যই ছিল প্রবল। এখানে ইসলাম প্রসারের প্রারম্ভিক যুগে বাঙালি হিন্দু আর বৌদ্ধদের মধ্যে এইসব সাধকদের প্রভাবেই ইসলাম-ধর্মে গণধর্মান্তরণের ঘটনা ঘটেছিল। সেই সময় দলে-দলে যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষ-নির্ধারিত দৈনন্দিন জীবনের আচার-আচরণ, নাম-পদবী ইত্যাদি সাথে-সাথেই পরিবর্তিত হয়ে যায় নি। সুফী সাধকগণ ধর্মের এইসব বহিরঙ্গের উপর তেমন কোনো জোরও দেন নি। ফলে, ধর্মান্তরিত হলেও তৎকালীন বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের আমোদ-প্রমোদের উপকরণ, পোশাকপরিচ্ছদ, দৈনন্দিন জীবনের বহু লৌকিক ক্রিয়াকর্মের আচার-আচরণ ইত্যাদি দেখে তাদের পৃথক করে চিনে নেয়া দুরূহ ছিল। অর্থাৎ, ধর্ম উভয় সম্প্রদায়ের সমাজজীবনে বিশেষ কোনো ব্যবধান রচনা করতে পারে নি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত মোটামুটি এই ব্যবস্থাই বিদ্যমান ছিল। এরপর শুরু হয় ফরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল কথা ছিল বিশুদ্ধ ইসলামে প্রত্যাবর্তন। কোরান এবং হাদিসের অনুসারী নয়, এমন যা-কিছু ঐতিহ্য এবং লোকসংস্কৃতির উত্তরাধিকার, তা নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলার এক উদগ্র আগ্রহ এই আন্দোলনের প্রভাবে গড়ে উঠতে থাকে। ফলে, যে নবান্নের অনুষ্ঠান হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে ঘরে-ঘরে মহানন্দে পালিত হত মুসলমান পিউরিটানরা ঘোষণা করে দিল, হিন্দুদের মতো এই অনুষ্ঠান পালন করা নাকি হারাম। হিন্দু-দের বিভিন্ন পূজা-উৎসবে মুসলমানরাও সোৎসাহে যোগ দিত। বিশুদ্ধ ইসলামে প্রত্যাবর্তনবাদীদের প্রবল প্রচারের ফলস্বরূপ দেখা গেল মুসলমানরা এই-সব পূজা-উৎসবের ধারেকাছেও আর ঘেঁষছে না। অনেক উদারমনা হিন্দু এই বলে আক্ষেপ করলেন, 'মুসলমানরা কেমন যেন হয়ে গেছে।' কিন্তু সত্যিই তারা "কেমন হয়েছে" কেন, খোঁজ নেবার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর বিশ্ব-ভারতীতে দেয়া বক্তৃতায় এই বিষয়টির উল্লেখ করে ছিলেন। মুসলমানদের বিবাহ-অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে, বিশেষ করে মহিলামহলে, প্রচুর গীত, বাদ্য এবং নৃত্যের প্রচলন ছিল। ঘট, আমপাতা, ধানদূর্বা, কলা-গাছ ইত্যাদির ব্যবহারও ছিল অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ইসলামি বিশুদ্ধতাবাদীদের প্রচারের দাপটে এইসব ছাঁটাই হয়ে যেতে থাকে। বিশেষ করে মেয়ে-মহলে বাদ্যসহকারে গীত এবং নৃত্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের দৈনন্দিন জীবনধারণের গ্লানির ফাঁকে-ফাঁকে সাংস্কৃতিক জীবনটাই বরবাদ হয়ে যায়। কারণ, এই-সব গীত এবং নৃত্য বিয়ের আগের কয়েক রাত ধরে পরিবেশিত হত ঠিকই, কিন্তু এর চর্চা জিইয়ে রাখতে হত। ঠিক এইরকমই যাত্রাগানের মহড়ায় কিংবা

আসরে যোগ দেওয়াও মুসলমানদের পক্ষে হারাম ঘোষিত হয়। ফলে দু-চারজন দলছুট ছাড়া বেশির ভাগ শিল্পমনস্ক মুসলমানই লোকসংস্কৃতির এত বড়ো শক্তিশালী মাধ্যম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইসলামি বিশুদ্ধতাবাদীরা পোশাক-পরিচ্ছদেও মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের ফারাক সৃষ্টিতে প্রয়াসী হয়, এবং মুসলমানদের মধ্যে ধুতি পরার প্রচলনটাকে প্রায় তুলে দিতে দিতে সক্ষম হয়। এইভাবে ক্রমেই উদাহরণ বাড়িয়ে যাওয়া যায়। এ থেকে প্রমাণ হয়, ইসলামি বিশুদ্ধতাবাদীরা প্রবল আন্দোলনের চাপে মুসলমানদের দৈনন্দিন সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনকে এমনভাবে পালটে দিতে পেরেছিল যে বাঙালি মুসলমানেরা তাদের পরম্পরাগত সামাজিক স্বরূপ হারিয়ে, অথবা বলা যায় অস্বীকার করে, নিজেদের বহিরাগত সংস্কৃতির বিশুদ্ধ উত্তরাধিকারী প্রমাণ করতে অধীর হয়ে ওঠে। এই শুদ্ধি-আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দু জমিদার-মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তথা প্রতিরোধের কর্মসূচী যুক্ত হয়ে যাওয়ায় আন্দোলনের প্রভাব হয়ে পড়ে সুদূরপ্রসারী।

এইভাবে বাঙালি মুসলমানরা যখন ক্রমেই নিজেদের মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধে সঙ্কীর্ণায়িত হয়ে উঠছে, এমনই এক যুগসন্ধিক্ষণে মূলত হিন্দু-সমাজের দিক থেকে শুরু হয় মানবতাবাদী নবজাগরণের আন্দোলন, এবং এই ধারায় রাজনৈতিক-স্বাধীনতাকামী ধ্যানধারণার চর্চা। কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে আমাদের দেশের এই জাতীয়-স্বাধীনতাকামী ধ্যানধারণা সেকিউলার রূপ পরিগ্রহ না করে হিন্দুধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। শুরু থেকেই রাজনৈতিক-স্বাধীনতাকামীরা অধিকাংশই ছিলেন হিন্দুধর্মীয় আদর্শের অনুসারী। শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতা ছিল তাঁদের আরাধ্য গ্রন্থ। তাঁরা দেশের অঞ্চলভেদে ভিন্ন-ভিন্ন দেবদেবীর সামনে শপথ নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রামে নামতেন। বাঙলায় শপথ নেয়া হত শক্তি-রূপিণী কালীর সামনে। এইসব রাজনৈতিক-স্বাধীনতা-কামীদের অনেকেই কামনা করতেন হিন্দুর গৌরবময় যুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। "জাতির জনক" মহাত্মা গান্ধীও স্বপ্ন দেখতেন "রামরাজ্য" প্রতিষ্ঠার। এই হিন্দুধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে যে দুজন অসামান্য-প্রতিভাধর মনীষী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন তাঁরা হলেন বঙ্কিমচন্দ্র এবং বিবেকানন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র-প্রচারিত জাতীয়তাবাদের আদর্শের মধ্যে প্রতিপক্ষ হিসাবে যাদের চিত্র পাঠকচিত্তকে আলোড়িত করে দুর্ভাগ্যক্রমে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই তারা মুসলমান। অনেকে বলেছেন, এরা শাসক মুসলমান মাত্র, মুসলিম জনগণ নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, একথা সত্যি কিনা তা আজো যুক্তিবিচার করে পাঠককে বোঝাতে হয়। সাধারণ পাঠক কি শাসক মুসলমান আর মুসলিম জনগণকে পৃথক করে দেখেন? ঔরঙ্গজেবের আচরণ কি অধিকাংশ হিন্দুই মুসলিম সম্প্রদায়ের সব মানুষের আচরণ মনে করেন না? আর সবচেয়ে বড়ো কথা হল, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী আদর্শ যে ছিল মূলত হিন্দুধর্মাশ্রয়ী, এ নিয়ে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই। বিবেকানন্দের উদারনৈতিক ধর্মীয় আদর্শ ছিল বেদান্তদর্শনভিত্তিক। তিনি আবেগমণ্ডিত চিত্তে হিন্দু-মুসলিম-মিলিত যে ভারতীয় জাতির কল্পনা করেছিলেন তার "দেহ ইসলাম" কিন্তু "মস্তিষ্ক বেদান্ত"। শুদ্ধি-আন্দোলনের প্রভাবে আপন ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য আর শ্রেষ্ঠত্ববোধে উদ্বুদ্ধ মুসলমানদের এসব কথা আদৌ ভালো লাগে নি।

কালক্রমে এই হিন্দুধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদের ধ্যানধারণাই হয়ে পড়ে আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের নিয়ামক আদর্শ। পাশাপাশি মুসলমানরাও যে জাগরণের আন্দোলন গড়ে তোলে তারও প্রায় সমগ্র প্রবাহটাই হয় ইসলামধর্মাশ্রয়ী। এইরকম পরিস্থিতিতে অনিবার্যভাবেই হিন্দু-মুসলমানের চিন্তা-ভাবনার জগতেও ব্যবধান দ্রুত বেড়ে যেতে থাকে। এই সঙ্গে সুচতুর ব্রিটিশের "ডিভাইড অ্যান্ড রুল" নীতির ইন্ধন যুক্ত হওয়ায় আমাদের সমাজদেহের

রন্ধ্রে-রন্ধ্রে দ্বিজাতিতত্ত্বের অনুপ্রবেশ ঘটে যায়।

অবিভক্ত বাঙলায় বাঙালি মুসলমানরা বাঙালি হিন্দুদের তুলনায় কিছুটা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেও ভারতবর্ষের জনসংখ্যার অনুপাতে সংখ্যালঘুমনস্কতা থেকে বাঙালি মুসলমান সেদিনও মুক্ত ছিল না। আর সংখ্যালঘুমনস্কতা বা মাইনরিটি কমপ্লেকসের কারণেই তারা অনেক বেশি আবেগ এবং গোঁয়ারতুমির সঙ্গে আপন জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় তৎপর হয়ে ওঠে। হিন্দুধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদ তাদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। তাই তাদের জাতিগত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষার আগ্রহাতিশয্যে পাকিস্তানের দাবি যখন উঠল তখন ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের মতোই বাঙলাদেশেও সংখ্যাগুরু বাঙালি মুসলমান এই দাবিকে সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানিয়েছিল।

তাই একথা অত্যন্ত বাস্তব সত্য যে দেশভাগ হওয়ার পর যেসব মুসলমান এপার-বাঙলায় থেকে যেতে বাধ্য হন, তাঁদের বেশিরভাগেরই মন কিন্তু দ্বিজাতিতত্ত্বের আবেগপুষ্ট পাকিস্তানমনস্কই থেকে যায়, এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় তীব্র এক আশাভঙ্গের বেদনা। কারণ অনেকেই আশা করেছিলেন সে সমগ্র বাঙলাদেশই পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর সহসা অতিক্ষুদ্র সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়ার ফলে নতুন এক অসহায়তা যে পশ্চিমবাঙলায় মুসলমানদের আমূল নাড়িয়ে দিয়েছিল সেকথাও স্মরণে রাখা দরকার।

আগেই উল্লেখ করেছি, কলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা (সীমিতসংখ্যক কয়েকজনের কথা বাদ দিলে) প্রায় সবাই পাকিস্তান চলে যান। মফস্সলের শিক্ষিত মুসলমানেরাও, যাঁদেরই সামান্যতম সুযোগ-সুবিধা ছিল, তাঁরাও এইসব মহাজনদের পন্থাই অনুসরণ করেন। সম্পত্তিবিনিময় করে, কিংবা চাকরিবাকরির সুযোগসুবিধা নিয়ে সীমান্তবর্তী জেলাগুলির, বিশেষ করে উত্তর চব্বিশপরগনা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ আর মালদহ জেলার মধ্যবিত্ত মুসলমানদের মধ্যে পাকিস্তান চলে যাবার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল সবচেয়ে বেশি। এইসব সীমান্ত-জেলায় পূর্বপাকিস্তান থেকে ক্রমাগত হিন্দু উদ্বাস্তু আগমনের ফলে, এবং বহু ক্ষেত্রেই তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলমানদের সম্পত্তি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্বসংঘাত সৃষ্টি হওয়ার ফলেও, অনেকেই নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। কোথাও বা উদ্বাস্তুদের জবরদখলের জবরদস্তির কাছে নতি স্বীকার করে কিংবা তিক্ত সাম্প্রদায়িক পরিবেশে ভয় পেয়ে অনেকেই সীমান্তপারে চলে যেতে থাকেন। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে দেশত্যাগের এই হিড়িকের মূলে আরো একটি কারণ ছিল। ছোটো-বড়ো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রায়ই ঘটে চলেছিল।

হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি জেলার মুসলমানেরা সীমান্ত থেকে দূরে থাকায় বাস্তবপরিস্থিতিগত কারণে দেশত্যাগের হিড়িক তাঁদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়। কিন্তু তাঁদের ঘরেও যেসব ছেলে লেখাপড়া নিয়ে একটু মাথা তুলতে থাকে, তাদেরও বেশির ভাগেরই প্রবণতা হয় একটু যোগাযোগের সুযোগ-সুবিধা পেলেই চাকরিবাকরি বা কোনো একটা অর্থকরী উদ্দেশ্য নিয়ে পাকিস্তান চলে যাওয়া। বাস্তবিক, ষাটের দশক পর্যন্ত এপার-বাঙলার পরিস্থিতি এমন ছিল যে শিক্ষিত মুসলমানেরা যে এই দেশের মাটিতে থেকেই আপন ভাগ্যকে জয় করবার চেষ্টা করবেন সেরকম মনোবল (morale) ছিল না। এই সময় অস্তিত্বরক্ষার যতটুকু সংগ্রাম তাঁরা করেছেন তা কেবল জৈবিক (biological) প্রবর্তনায়।

দেশবিভাগের পর যতই সময় অতিবাহিত হতে থাকে ততই নতুন জেনারেশনের শিক্ষিত মুসলমান ওদেশে চলে যাবার তাগিদ কম বোধ করতে লাগলেন। তা ছাড়া, সুযোগ-সুবিধাও করে উঠতে পারলেন না আগের মতো। অনেকে অবশ্য প্রথম থেকেই পারিবারিক ও অন্যান্য বাস্তবপরিস্থিতিগত অসুবিধার

কারণে এই দেশে থাকাটাই অপেক্ষাকৃত বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। এই দেশের হিন্দুধর্মাশ্রয়ী জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে তাঁদের জীবনধারণের সংগ্রামে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, তা মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়। যদিও এখানে একথাও উল্লেখ্য যে স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে সব ধর্মে সমান উৎসাহ প্রদান-গোছের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ তুলে ধরার একটি সরকারি প্রয়াস ছিল। সংখ্যালঘুদের মন থেকে ভয় এবং অপরাধবোধ দূর করার জন্যই নেহরু প্রভৃতি কয়েকজনের ছিল এই সৎপ্রয়াস। কিন্তু তাঁদের এই প্রয়াস সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের গণমানসে উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো রূপান্তর ঘটাতে পারে নি। ফলে, সংখ্যালঘু অংশের পক্ষেও ভয়ভীতির মানসিক জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয় নি।

তাই এখানে একজন শিক্ষিত মুসলমানের কেবলই মনে হয়, সে মুসলমান বলেই তার সামনে সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। তার সব সময়ই আশঙ্কা, চাকরি-বাকরি বা অন্য যে-কোনো সরকারি কিংবা বেসরকারি সুযোগসুবিধা পাওয়ার প্রশ্নে শুধু তার মুসলিম নামটার জন্যই সে বিশেষ পাত্তা পাচ্ছে না।

পথে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে আলাপ জমে উঠলে বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলমান অ-মুসলিম পরিবেশে নিজের নাম আর পরিচয় দিতে ইতস্তত করে। কারণ বহুক্ষেত্রেই তার অভিজ্ঞতা হল নামটা জানাজানি হলেই কখনও ব্যক্ত কখনও বা অব্যক্ত দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়।

এই মনোভাবের জন্য হয়তো শিক্ষিত মুসলমানের এক ধরনের মাইনরিটি কমপ্লেকসও খানিকটা দায়ী। এই কমপ্লেকসের জন্যই যাত্রা-থিয়েটার, গল্প-উপন্যাস অথবা সিনেমায় কোনো মুসলমানকে দুশ্চরিত্রের কিংবা নিম্নশ্রেণীর ভূমিকায় দেখলেই তার মনে হয়, শুধু মুসলমানকে হেয় করার জন্যই এমনটা করা হয়েছে। অবশ্য এর সবটাই কেবল কমপ্লেকসের ব্যাপার নয়। মুসলমান সম্পর্কে বহু হিন্দুর মনেই একটা বয়-বাবুর্চি, খানসামা-সহিস, লেটেল-লম্পট অথবা রাজাবাজারী কসাই মার্কা ধারণা খানিকটা সংস্কারের মতো রয়ে গেছে। বহু অমুসলমান লেখকদের দেখি, অনেক সময় অজান্তেই তাঁদের কলমে এইরকম সব মুসলমান চরিত্র বেশ জবরদস্ত রূপ পেয়ে যায়। মুসলমানদের সাংস্কৃতিক সুরুচি এবং সহজ স্বাভাবিক দিকটা যেখানে দেখানো হচ্ছে না, সেখানে শুধু এই অন্ধকার দিকটা দেখালে সেটা যে কোথায় গিয়ে আঘাত করবে, প্রায় সব সময়ই তাঁদের সে কথা খেয়াল থাকে না।

সারা কলকাতা শহরেই বাঙালি মুসলমান অনেকখানি সংকুচিত হয়ে থাকে। উরদুপাড়াতে সে তেমন সহজ হতে পারে না—কারণ ভাষার ব্যবধান। আবার হিন্দুপাড়াতেও সারাক্ষণই অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে থাকে—কারণ মুসলমানদের সম্পর্কে কটূক্তি যখন-তখনই কানে এসে যেতে পারে।

হিন্দুপাড়া ঘেঁসে যারা বাস করে তাদের মনের গহনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাভীতি প্রায় ভূতের ভয়ের মতো বাসা বেঁধে থাকে। তাই বারোয়ারি পুজোর নামে বা এই ধরনের সব ব্যাপারে জুলুম যতই হোক, তারা প্রায় মুখ বুজেই সহ্য করে যায়। কারণ সব সময় ভয়—প্রতিবাদ করলে যদি দাঙ্গা বেধে যায়। এইরকম নিরুপায় অবস্থা থেকে উদ্ভূত এক রকমের অপমানবোধ তাদের মনে নীরবে তুষের আগুনের মতো জ্বলতে থাকে।

এই ধরনের সমস্যাগুলির স্বরূপ অন্তত শিক্ষিত মুসলমানদের পক্ষে পক্ষপাতহীন ভাবাবেগশূন্যভাবে অনুধাবন করাটা ছিল অভিপ্রেত। তাহলে তাঁরা বুঝতেন, উল্লিখিত অপমানবোধ শুধু তাঁদের আছে এমন নয়, ভারতীয় জনসাধারণের অধিকাংশই ভিন্ন-ভিন্ন কারণে কিংবা অনুরূপ কারণেই এই একই লাঞ্ছনার শিকার। কিন্তু প্রকট সংখ্যালঘুমনস্কতা

তাঁদের চিত্তে তৈরি করেছে এমন এক দুর্লঙ্ঘ্য অবরোধ যার বাইরে এসে স্বাধীনভাবে যুক্তিবিচার প্রয়োগ করা তাঁদের অধিকাংশের পক্ষেই হয়ে পড়ছে অসম্ভব। তাই অতি সহজেই তাঁদের চিত্ত অভিমানক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সম্ভবত এই অভিমানের কারণেই তাঁরা আপন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জাহির করতে আর বজায় রাখতে এত আগ্রহী।

তাই দেখা যায়, বাস্তব প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে অদরকারি হয়ে পড়া সত্ত্বেও দীনী তালিম দেওয়ার জন্য মাদ্রাসাগুলিকে টিকিয়ে রাখা এবং সেগুলির সংখ্যা বাড়ানোর প্রতি আগ্রহ তাঁদের কিছুতেই কমতে চায় না। সারা পশ্চিমবাঙলায় প্রায় ছ-শ হাইমাদ্রাসা এবং সিনিয়র মাদ্রাসাগুলির কথা বাদ দিলেও (কারণ এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে তবু তো ধর্মবহির্ভূত বিষয়গুলির শিক্ষার উপর অনেকটা গুরুত্ব দেয়া হয়) বিশুদ্ধ ধর্মশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান খারিজী মাদ্রাসার সংখ্যাও কম নয়। পশ্চিমবাঙলার কতকগুলি জেলায় এমন অনেক মুসলিম-ঘনবসতিপূর্ণ থানা আছে যেখানে এক বা একাধিক খারিজী মাদ্রাসা চোখে পড়বেই। এইগুলি সম্পূর্ণত বেসরকারি মাদ্রাসা কেবলমাত্র জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রভূত পরিমাণে অর্থসাহায্য আসছে, এরকম একটা প্রচলিত ধারণা আছে। ধর্মবহির্ভূত কোনো বিষয়ই এখানে শেখানো হয় না। এই ধরনের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য কোনোরকম কেন্দ্রীয় অনুমোদন লাগে না। এই-সব মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য হল : 'ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষকের যোগ্যতা এবং পঠন-পাঠনের মান যেমনই হোক না কেন, প্রায় প্রতিটি মাদ্রাসাকেই ইসলামিক তত্ত্ব শিক্ষার একটি কলেজ কিংবা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্য মর্যাদার আসন দেয়া হয়।' (মুসির-উল-হক, ইসলাম ইন সেকিউলার ইন্‌ডিয়া, পৃ. ২৯)। একথা বলাই বাহুল্য যে এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করে যারা বার হয় তাদের মুখটা ফেরানো থাকে কালের গতির পিছন দিকে।

মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের সংস্কার এবং সমাজ-জীবনের নানা কুপ্রথা দূরীকরণের প্রশ্নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার যে দু-একটা বিচ্ছিন্ন প্রয়াস মাঝে-মাঝে দেখা গেছে তার প্রতি শিক্ষিত মুসলমানদের ব্যাপক অংশেরই কোনো সহানুভূতি নেই। কারণ হিসেবে অনেকেই বলেন, এসব এখন তাঁদের জীবনের কোনো মৌলিক সমস্যা নয়। মৌলিক সমস্যা বলতে তাঁরা যা বোঝেন তার নির্গলিতার্থ হল—'সংখ্যালঘু হিসাবে আমরা এখন চারদিক থেকে কোণঠাসা, আত্মবিকাশের সংগ্রাম আমাদের ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে পড়ছে; এই অবস্থায় নিজেদের আভ্যন্তরীণ সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে মাতামাতি করার কোনো অর্থ হয় না।'

সম্প্রদায়ের নিজস্ব পত্র-পত্রিকার উপরও মুসলমানদের অদ্ভুত এক মমতা দেখা যায়। আসলে প্রচলিত সংবাদপত্র, সাহিত্যপত্রিকা ইত্যাদিতে তাঁদের নিজস্ব জীবনধারার বিশেষ প্রতিফলন না থাকার কারণেই এই মনোভাব প্রবল হয়েছে। কিছু ধুরন্ধর মুসলমান ব্যবসায়ী এই সেনটিমেনটে সুড়সুড়ি দিয়ে কয়েকটি সাপ্তাহিক মাসিক ইত্যাদি প্রকাশ করে দু-পয়সা করে খাচ্ছেন। বলাই বাহুল্য, এইসব পত্র-পত্রিকার বেশির ভাগেরই মান অত্যন্ত নিম্নস্তরের। কারণ, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, পর্যাপ্ত অনুশীলন এবং অধ্যবসায়ের নিদারুণ অভাব। চিত্তবৃত্তি হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন থাকলে এই ধরনের চিন্তাগত দেউলিয়াপনা প্রকাশ পাওয়াটাই স্বাভাবিক নিয়ম। তথাপি এই-সব পত্র-পত্রিকার কোনো-কোনোটির পাঠকসংখ্যা নেহাত কম নয়।

বাঙালি মুসলমানদের একটা ভালো দৈনিক নেই বলে অনেকেরই ক্ষোভের অন্ত নেই। ভালো ব্যাবসা-বাণিজ্য করেন এমন কতিপয় বাঙালি মুসলমানের মুখে যে খেদোক্তি শুনেছি তা মোটামুটি এই-রকম, 'আমরা প্রায় এক কোটি মুসলমান এই বাঙলায় বাস করি, আমাদের কি আনন্দবাজার-যুগান্তরের

মতো একটা দৈনিক চলতে পারে না? উরদুভাষীরা মাত্র কয়েক লক্ষ এই কলকাতা আর তার আশপাশে বাস করে, অথচ তাদের আছে ছ-সাতটি দৈনিক! আমরা কি এতই অপদার্থ যে ভালো একখানা দৈনিকও চালাতে পারি না?' সম্প্রতি জানা গেছে, এঁদের আকাঙ্ক্ষিত এই "ভালো" দৈনিক পত্রিকার প্রকাশ আসন্নপ্রায়।

সংবাদপত্র ছাড়াও গল্প-উপন্যাস, সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার, রেডিও, টেলিভিসন ইত্যাদি নিয়েও যে মুসলমানদের ক্ষোভ আছে সে প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করেছি। আসলে জনসংযোগের এই মাধ্যমগুলিতে মুসলমানদের জীবনধারার প্রকৃত চিত্র ক্বচিৎ খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে যাত্রায় তো ঐতিহাসিক পালার নামে বিগত দিনের মুসলিম শাসকদলের বিকৃত উপস্থাপনা আজো সমানে অভিনীত হয়ে চলেছে বহু আপত্তি সত্ত্বেও। কিন্তু এসবের বিরুদ্ধে পালটা কিছু গড়ে তোলা এখনও মুসলমানদের সাধ্যের বাইরে। কারণ, তাঁদের মানসভূমি আজো যথেষ্ট পরিমাণে কর্ষিত হয় নি। সংস্কৃতির চর্চায় আগ্রহী মানুষরা সংখ্যায় নগণ্য, এবং সমাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠাও যৎসামান্য। এখনও এখানে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে মূলত ধর্মীয় নেতা কিংবা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ চিন্তায় অভ্যস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তা ছাড়া, সব-চেয়ে বড়ো কথা হল, যতদিন বাঙালি মুসলিমচিত্ত হিন্দু সংস্কৃতির আগ্রাসনের ভয়ে সংশয়ান্বিত হৃদয়ে আপন স্বাতন্ত্র্যরক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ধর্মীয় তথা সামাজিক সংকীর্ণ ধ্যানধারণাগুলি লালন করবে, যতদিন তাঁদের চিত্তবৃত্তি সংখ্যালঘুমনস্কতাজনিত হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন থাকবে, ততদিন জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই কোনো মহৎ সৃষ্টি তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। সব সৃষ্টিশীলতার মূলেই আছে আত্মপ্রত্যয়—হয় ব্যক্তিগত নয় গোষ্ঠীগত।

পরিশেষে বলতে হয়, ১৯৭১ সালে সীমান্ত-পারে নতুন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এপার-বাঙলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপরই বেশ শুভ হয়েছে। বিশেষ করে মুসলমানদের সম্পর্কে অধিকাংশ হিন্দুর উন্নাসিকতা আর বিদ্বেষ অনেকাংশে অপসারিত হয়েছে বলা চলে। এখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত পত্র-পত্রিকায় মুসলমানদের লেখা মাঝে-মাঝেই চোখে পড়ে। তাঁদের জীবনধারার কিছু-কিছু প্রকৃত চিত্রও এইসব গণমাধ্যমগুলিতে প্রতিফলিত হয়। কিছু-কিছু গল্প-উপন্যাসেও তাঁদের জীবনের প্রতি সাগ্রহ ও সশ্রদ্ধ আলোকপাত করা হচ্ছে। তা ছাড়া, ওপার-বাঙলার গতিশীল ধ্যানধারণাসম্বলিত বইপত্রও ক্রমেই কিছু-কিছু করে এদেশে এসে পড়ছে। এসবের ফলে ধীরে-ধীরে যে বাতাবরণ গড়ে উঠছে তা ভারতীয় বাঙালি মুসলমানের জীবনে নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করে।

প্রতিপক্ষ

রফিকুর রশীদ

কাঁচা বাজারের ওই দিকটায় নুরুলকে দেখে সুড়ুত করে টিনের চপ-দোকানটার পেছনে আড়াল হয়ে গেল নৈমদ্দি। যেন এক টিয়েপাখি বাইরের হাওয়া বুঝে গাছের খোঁড়লে গা ঢাকা দিল।

নুরুল তার আপন ছেলে। একমাত্র সন্তান। মেয়ে আছে বটে একটা, আপন ছেলেপুলে-ঘরসংসার নিয়ে সে এত ব্যস্ত যে বুড়ো বাপ সেখানে খড়কুটো। নাতি-নাতনিগুলোও কেমন চোখ ঠেরে-ঠেরে তাকায়, যেন নানা-টানা বলে সংসারে কোনো কিছু থাকতে পারে তা ওদের বিশ্বাসই হতে চায় না। এমন সম্পর্ক বুঝি কারো থাকে না কখনো।

চপদোকানের আড়াল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে নুরুলের গতিবিধির ওপর নজর রাখল খানিকক্ষণ। নতুন করকরে আমড়াঝাঁটির পটোল নিয়ে বসেছে একটা লোক, পাশেই কচি-কচি বিলিতি ঢ্যাঁড়শের একটা ঢিবি। নুরুল এইখানে একটু দাঁড়াল। একটা হৃষ্টপুষ্ট পটোল হাতে তুলে ডুরেকাটা শরীরটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে আবার রেখে দিল বোধ হয়। বেশ কটা খদ্দের একসাথে জড়ো হওয়ায় হাতের পটোলটা নুরুল কী করল তা আর দেখা গেল না। কিন্তু ঐ ভিড়টা সরে যেতেই চোখে পড়লো, আস্ত একটা, ঢ্যাঁড়শ তুলে নিয়ে নুরুল সরু ডগাটায় চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলল, কী যেন বলল ওর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মাঝবয়েসী লোককে, তারপর কপাত করে মুখে পুরে দিল ওই কাঁচা ঢ্যাঁড়শটা। নৈমদ্দির পেটের ভেতর থেকে মাথার মগজ পর্যন্ত কেমন গুলিয়ে উঠল, এ কি মুড়িমুড়কি নাকি, অ্যাঁ! কাঁচা তরিতর-কারি অমন কাঁচায়-কাঁচায় কেউ খেতে পারে! তবে আর নুনঝাল দিয়ে সেদ্ধকরা কেন! সারা গা কেমন রি-রি করে ওঠে নৈমদ্দির, নাড়িতে-ভুঁড়িতে পর্যন্ত তারই খবর পায় যেন। মনে-মনে গজগজ করে, খা দেখি, একটা কি দুটো উচ্ছে কাঁচায়-কাঁচায় খেয়ে ছাখ! আবার ভাবল, বিশ্বাস নেই, ওর রাক্ষুসে মুখ সব পারে। দুবার ওয়াক-ওয়াক করে এবং বেশ কবার

থুতু ফেলে দোকানের আড়াল থেকে নিজেকে বাইরে নিয়ে এল। পাকুড়ের চারাটার বেশ ডালপালা গজিয়েছে। এবারের বর্ষায় যেন বেশি বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে, উঠতি কিশোরীর মতো। পাকুড়তলা থেকেই চোখ গেল নূরলের দিকে। মেছোবাজারের মধ্যে ঘুর-ঘুর করছে ও। চুনোপুঁটির পাঁজাটা যেন ওর পছন্দ হল না মোটেই। একবার তাকিয়ে সরে গেল। নবাবের বাচ্চা!

আবার ভিড়ের মধ্যে নূরুলকে হারিয়ে যেতে দেখে নৈমদ্দি নিজেকে নিরাপদ বোধ করল। পাকুড়-তলা থেকে সে ইউনিয়ন পরিষদের অফিসের সামনে চলে এল। এই জায়গাটায় লাইন দিয়ে সব চাল এবং ময়দার ফড়িয়ারা বসে। নৈমদ্দি তাকিয়ে দেখল। ফড়িয়ারা সবাই সারের বস্তা বিছিয়ে তার ওপরে চাল এবং ময়দার ছোটো-ছোটো পাহাড় সাজিয়ে বসেছে। ফটফটে সাদা পাহাড়ের গায়ে টিনের দাঁড়িপাল্লা ঘষে-ঘষে কেমন মসৃণ করে রেখেছে। খদ্দের এলে মেপে দিচ্ছে, মসৃণতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আবার ঘষে-ঘষে ঠিক করে রাখছে। এ যেন ওদের এক অদ্ভুত খেলা। নৈমদ্দি একটা চালের পাহাড়ের কাছে বসে ধীরে-ধীরে ওই কোমল পাহাড়ের গায়ে হাত বুলাতে-বুলাতে জিগ্যেস করে, 'কতো কইরি দাঁড়ি?'

ফড়িয়া কিন্তু প্রথমেই দাম বলল না। ক্রেতার দিকে পূর্ণচোখে ভালো করে তাকাল। কী যেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে, এবং জরিপ করছে। নৈমদ্দির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এতক্ষণে পাহাড়ের মাথা থেকে একমুঠো চাল তুলে নিয়ে দুই হাতের তালুতে নাড়াচাড়া করছে গভীর মনোযোগ দিয়ে। ফড়িয়া বোধ হয় ক্রেতার ওপর আস্থা আনতে পেরে দাম বলল, 'আট টাকা সের চাচা, বারো টাকা দাঁড়ি।'

প্রচলিত ওজন ছাড়াও এই এলাকায় একটা স্থানীয় মাপের চল আছে—দেড় সেরে এক দাঁড়ি। নৈমদ্দি কতদিন নিজে হাতে একদাঁড়ি চাল কেনে নি। কতদিন মানে কত বছর যেন, যুগটুগ পার হয়ে গেছে বোধ হয়। দিন দশ-পনেরো আগে নূরুল কোত্থেকে যেন দাঁড়িখানেক চাল যোগাড় করেছিল, পরপর দুদিন দুবেলা বেশ হয়েছিল ফ্যানে-ভাতে। গরম ভাতের ভাপে সেদিন তার সারা শরীর গরম হয়ে গিয়েছিল। গত দুমাস ধরে সে বিছানায় পড়ে আছে, ওষুধ নাই, পথ্যি নাই, একথাবা গরম ভাতেই যেন সব রোগ তার নিমেষে সেরে গেল। ভাতকে সেদিন তার শুধুই ভাত মনে হয় নি, মনে হয়েছিল সবরোগের মোক্ষম ওষুধ। পরপর দুদিন তার শরীরটা বেশ ভালো গেল। ঝরঝরে বোধ হল। আবার নেতিয়ে পড়েছে এই দেহ ভাতের জন্যে—ওই ওষুধের জন্যে।

দুহাতের তালুতে বিছিয়ে রাখা চালের আস্তরণের দিকে গভীর মনোযোগ দিয়ে কী যেন পর্যবেক্ষণ কর-ছিল নৈমদ্দি। এবার ডান হাতের চাল কটা হাঁ করে মুখের মধ্যে ফেলে দিল। কটকট করে দাঁতের জাঁতায় পিষল। তিনকুড়ি বয়স হয়েছে বটে, মাড়ির দিকে এখনো তার গোটাকতক দাঁত আছে। তারই মধ্যে নড়বড়ে একটাতে আঘাত পেয়ে তার মুখের মানচিত্র বিষণ্ণ হয়ে গেল। ফড়িয়া হাতের মুঠোয় দাড়িপাল্লা বাগিয়ে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'কট্টুক দেব, অ চাচা?'

'অ্যা!' নৈমদ্দি জবাব তৈরি করেই রেখেছিল, তবু একটু চমকাবার ভান করল, তারপর মন্তব্য ছুঁড়ল, 'তুমার এ চাল তো বাপ ভাত হয়িই বয়িচে, রান্ধা লাগবে না।'

ফড়িয়া কথা বলে না। কটমট করে তাকায়। যেন কিছুক্ষণ আগের জরিপের সঙ্গে এখনকার নৈমদ্দির চেহারার মানচিত্রের আঁকিবুঁকি মিলিয়ে নিচ্ছে। এতে অবশ্য নৈমদ্দির কোনো ভাবান্তর দেখা যায় না। সে বাঁ হাতের তেলোয় রক্ষিত চালটুকু মুঠোয় ঢেকে উঠে দাঁড়ায়,

'বড্ড লরম চাল বাপু। ই তুমার কিডা নেবে পয়সা দিয়ি?'

নৈমদ্দি এরপর আর সেখানে দাঁড়ায় না। টুকটুক

করে কেটে পড়ে। আবার পাকুড়তলায় এসে দম নেয়। বাঁ হাতের চাল কটা এগাল-ওগাল করে খেয়ে ফ্যালে অবশেষে। ভিড়ের মধ্যে তার একমাত্র সন্তানকে সন্ধান করতে চেষ্টা করল। ছুপা এগিয়ে মেছো-বাজারের গোড়াটা পর্যন্ত গেল। তাকাল। হ্যাঁ, ওই-তো সবার ওপরে মাথা দেখা যাচ্ছে। চ্যাঙা শরীর, মাথায় উঁচু। আরে, ইলিশ মাছের গায়ে হাত দিয়ে টিপে দেখছে যে বড়! ভারি বিস্ময় বোধ করে নৈমদ্দি; এক আধ-সের কিনে ফেলবে নাকি! কিন্তু মাছ কেনার মতো এত টাকা কামাল কোথায়! আষাঢ়-শ্রাবণে কোথাও কাজকর্ম নেই। নেই আবার! কিছু না কিছু কাজ ঠিকই আছে। সারা গাঁয়ের সবাই কি আর বসে থাকে! নৈমদ্দির বুকের কোনায় কালো এক দাঁড়কাক উঁকি মেরে যায়। একা শুধু নূরুলের কাজ হয় না, একেবারে অবিশ্বাস্য। তা হলে যে ও এত করে মেছোবাজারে ঘুরঘুর করছে, সে কোন্ সাহসে, কোন্ পুঁজিতে! তা কেনে তো কিছুক না, নিজেকে বুঝ মানানোর চেষ্টা করে, এদিকে আমি দুমুঠো চালই না হয় যোগাড় করি! প্রথম কিস্তির চালটুকু হাপিস করে ফ্যালার জন্যে এতক্ষণে তার একটুখানি দুঃখ হল, অনুশোচনা হল। আবার তাকাল নূরুলের দিকে, নাহ্, শালা চলে যাচ্ছে। কেন, কাঁচা মাছই তুলে খা না খানিক! ওই তো পাশেই কাটা-মাছ বিক্রি হচ্ছে, দু টুকরো তুলে মুখে দে! রাক্ষসের বাচ্চা খোক্কস কোথাকার! খা, তোর যা মন চায়, গিলে খা! ইলিশ মাছের চকচকে শরীরকে উপেক্ষা করে নূরুলকে চলে যেতে দেখে মেজাজ খিঁচড়ে যায় নৈমদ্দির। সপ্তায় এই একটাই মাত্র হাটের দিন, দু জাগার দুমুঠো চাল তুলে যদি খাই তোর এত বাধে কেন? ঘরেও খাতি দিবি নি, বাইরেও যাতি দিবি নি, আমি কি মরব নাকি!

মেছোবাজারের মুখ থেকে পাকুড়তলায় ফিরে আসে নৈমদ্দি। একটু দাঁড়ায়। মনটাকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করে। এক-পা দু-পা করে হাঁটতে-হাঁটতে ইউনিয়ন পরিষদের সামনে চলে আসে। হঠাৎ লক্ষ করে, কেশবপুরের গোলাম ফড়িয়া তার দিকে কেমন যেন টিকটিকির চোখে তাকাচ্ছে। সেও চোখে চোখ ফেলে খুব ভালো করে একবার তাকাল। কাঁধের ওপর দিয়ে একটা শুঁড়ওয়ালা তেলাপোকা হেঁটে যাবার অনুভূতি হল তার। নাহ্, আজ আর ওই হারামির বাচ্চার চালে হাত দেবে না। ঠিক ওই শালাই নূরুলের কানে কথা লাগিয়েছে। ভারি তো দুদিন দুমুঠো চাল নিয়ে খেয়েছে, তোর কি পাহাড় ধসে সমান হয়ে গেল! আর আপন ছেলেটাও একটা আস্ত হারামি। গোলাম তোর চোদ্দপুরুষের খাটাশ হয়, তার কথায় কান ভারি করলি, কেন বুড়ো বাপটা যে তোর খিধের জ্বালায় কুকুর হয়ে ঘোরে, সেদিকে চোখ গেল একবার! মনের ভেতরে গজগজ করতে-করতে চালের লাইনের একেবারে শেষমাথায় এসে দাঁড়াল। তাকিয়ে চোখ দুটো ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মাথার চাঁদিতেও এক টুকরো বরফের অস্তিত্ব অনুভব করল। লাইনের শেষ-প্রান্তে নতুন একটা ফড়িয়া ধবধবে সাদা চিকন চাল নিয়ে বসে আছে। খদ্দেরের ভিড় নেই। এই হাটে আগে আসে নি বোধ হয়। নৈমদ্দির একটুখানি মায়া হল বেচারার জন্যে। তবু সাদা ঝকঝকে চালের পাহাড় যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল তাকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে বসে পড়ল ওই পাহাড়ের পাদদেশে। মোলায়েম করে হাত বুলাল পাহাড়ের সারা গায়ে। হাতের তালু উলটে দেখল, ধবধবে সাদা চালের রঙ হাতে লেগে গেল নাকি! কথা পাড়ল, 'এ আবার কী ধানের চাল রে বাবা!'

ফড়িয়া যেন অনেক সাধনায় একটা খদ্দের পেয়েছে নাগালে, খুব মনোযোগ দিল তার দিকে—'ইরি ধানের চাল।'

'বকের মোতোন সাদা ধবধব কচ্ছে।'

নৈমদ্দি খুব প্রশংসা করল চালের। তার হাতের মুঠোয় ততক্ষণে একঝাঁক সাদা বক ধরা পড়ে গেছে। সে বলল, 'কত কইরি দাঁড়ি?'

খদ্দেরের আগ্রহ দেখেই হোক আর তার চালের গুণগত মানের কারণেই হোক, সে আট আনা বেশি দাম হাঁকল, সাড়ে বারো টাকা।

'ওরেব্বাস্! তুমার আবার আট আনা বেশি!'

এই আট আনা বেশিটাই যেন নৈমদ্দির কাছে খুব বেশি হয়ে পড়েছে, অন্তত তার কথা বলার ধরন দেখে তা-ই মনে হবে, যেন বোঝার ওপর শাকের আঁটি। মনে-মনে একটু হাসল, শাকের আঁটির কথা তো পরে আসে, তার নিজের বোঝাটাই কি আদৌ আছে! যত্তোসব আবোলতাবোল চিন্তা। সেই বাজে চিন্তা বেশিক্ষণ না করে একমুঠো চাল মুখের গহ্বরে ঠেলে দিল, এ-মাড়িতে ও-মাড়িতে চিবিয়ে নিল। তারপর একেবারে অকস্মাৎ থু থু করে উঠল,

'থু! থু! তেতো নিম! এ যে দেখছি পোড়া-ধানের চাল! থু!'

খুব থুথু করল নৈমদ্দি। কিন্তু বিশেষ কৌশলে, যাতে ওই থুথুর সাথে একটা চালও মুখ থেকে বেরিয়ে না যায়। ফড়িয়াটা যেন তাৎক্ষণিকভাবে কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, তাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রেট নামিয়ে ফেলল,

'ঠিক আছে, আমিও আট আনা কম নিচ্চি। বারো টাকাই সই।'

হু! নৈমদ্দিকে আট আনা কম দিচ্ছে, মানে আট আনা ভিক্ষে দিচ্ছে! আরে বাবা, ভিক্ষে দিবি তো বিনিশর্তে দে, বিনিপয়সায় দে। নৈমদ্দির কাছে বারো টাকাই কী, আর বারো পয়সাই কী—সব সমান। কিন্তু ফড়িয়াটা যেন খদ্দের হাতছাড়া করতে রাজি নয়, 'কটুক দেব চাচা?'

নৈমদ্দি ভারি প্রমাদ গোনে। তবু আর একমুঠো চাল মুখে পুরে চিবিয়ে ছাতু করে রস গিলে নিয়ে বলল, 'নারে বাবা, এ চাল আমরা খাতি পারবু না। তেতো, ওয়াক থু, থু!'

সেই বিশেষ কৌশলে চাল বাঁচিয়ে থুতু ছিটিয়ে ধীরে-ধীরে উঠে এল সেখান থেকে।

ইউনিয়ন পরিষদের পশ্চিমে টিউবয়েল। কল চেপে পেট পুরে পানি খেল নৈমদ্দি। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল স্বস্তির, তৃপ্তির। একটা ঢেকুরও উঠতে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল। বাহ্, এতক্ষণে আপনা-আপনি মনের ভেতরটা বেশ ফুরফুরে হয়ে উঠল। বুকের ভেতরের কোনো এক ধবল আকাশ হয়ে যেন সেই সাদা ধবধবে বকগুলো ডানা মেলে দিল। এবার পান খাবে নাকি একখিলি! খাবে, কিন্তু চার আনা দাম। এই তো ক বছর আগেও পাঁচ পয়সা খিলি পান ভূতে খেত না। আর এখন টাকার মধ্যে এক সিকি। দামের কথা মনে হতেই নৈমদ্দি ভেতরে-ভেতরে খুন-খুন করে হেসে উঠল পুরোনো ভঙ্গিতে। চার আনাই কী, আর চার টাকাই কী! নৈমদ্দির তো কিস্যু আসে যায় না। বাড়ুক বাড়ুক, দাম বরং আরো বাড়ুক, আকাশ ছুঁয়ে যাক। যারা পয়সা দিয়ে পান কিনে খায়, দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কজন ঠোঁট রাঙিয়ে বাবুগিরি করে দেখা যাবে। ওসব নিয়ে নৈমদ্দির কোনো ভাবনা নেই। পান আর চুন নিয়ে বসে আছে একসারি লোক। নৈমদ্দি হাঁটতে-হাঁটতে সেইখানে গেল। প্রায় তার বয়েসী একটা পানওয়ালার পাশে বসে পড়ল থপ করে। আষাঢ়ে পানের সস্তা খদ্দের, তবু লোকটার কাছে কোনোই ভিড় নেই। একবার তাকাল নৈমদ্দির দিকে, তারপর বিচিত্র ভঙ্গিতে পানের বোঁটা সাজাতে লাগল। কিন্তু নৈমদ্দির তো বসে থাকলে চলবে না। এদিকে আবার বেলা যায় যায়। সে দৃষ্টি আকর্ষণ করল, 'অ আবুল, তুমার বড় ছেইলির নাকি পেথক হওয়ার বাই উঠেছে!'

আবুল পানওয়ালা কোনো সাড়া দিল না। নৈমদ্দি ভাবল, এ প্রসঙ্গটা উত্থাপন করা বোধ হয় ঠিক হল না। তবু কিছুটা সংশোধন করে নেবার চেষ্টা করে,

'ওই যি আমার আপন ছেইলি নুরুল, হারামির হাড়, আমাক কি খাতি-পরতি ছায় নাকি!' আবুলের

চেহারার জলছবিতে কী লেখা আছে, একটুখানি থেমে পড়ে নিয়ে আরো একটু দরদ ঢেলে দিল, 'দুনিয়াডাই অ্যামধারা হয়ি যাচ্ছে ভাই, তুমি কী করবা! ছেইলিপিলিকি যদ্দিন বুকির মদ্দি রাখবা তদ্দিন ভালো, সেয়ানা হয়ি পাখা গজালিই ফুড়ুত।' সহানুভূতির জুঁইফুল ঝরে পড়ে কণ্ঠ থেকে। তৎক্ষণে পানের গায়ে চুন লাগিয়ে হাতের মুঠোয় দলা পাকিয়ে ফেলেছে। এই মুহূর্তে সুপারির প্রয়োজনীয়তার কথা আর ভাবছে না সে। আবুল সব দেখেও কিছু বলল না। তার ছেলের প্রসঙ্গ ওঠায়, শুধু একবার ঘাড় তুলে তাকাল মাত্র। নৈমদ্দি হাঁটুতে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কী মনে করে ঘুরে দাঁড়িয়ে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে ফেলল, 'তুমার তো তবু ব্যাবসাপাতি আছে, আমার যে তাও নি, অ্যাট্টা বুদ্ধি ছাও দিনি!'

এতক্ষণে আবুল যেন একটু আন্তরিকতার গন্ধ পেল। নিজেই ডেকে বসাল নৈমদ্দিকে। আবার ধপাস করে বসে পড়ল সে। কী কথায় কী কথা এসে গেল! ছট করেই এখন যেন আবুলকে খুব কাছের মানুষ, আপনজন মনে হচ্ছে তার। আবুলও ঠোঁট থেকে অর্ধদগ্ধ বিড়িটায় শেষ দম না দিয়েই নৈমদ্দির হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে বেশ উদার করে তুলল। দুই বৃদ্ধ কেমনভাবে যেন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল।

সন্ধ্যার অন্ধকারের কথা ভেবে আবুলের কাছ থেকে আরো এক খিলি পান খাবার পর নৈমদ্দি একসময় বাড়ি ফেরার তাগাদা অনুভব করল। পানের রসটুকু সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ার পরে আরো একটা আস্ত বিড়ি খেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু আবুলের কাছে আর সে কথা বলা যায় না। উশখুশ করে উঠে এল।

উঠে এল মাইকে গান শোনাবার ভান করে বিভিন্ন কোমপানির বিড়ির প্রচার চলছে যেখানে, সেইখানটায়। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাদের প্রচার শুনল কিছুক্ষণ। বিড়ির মধ্যেই নাকি পুরস্কারের কাগজ জড়ানো আছে। গাঁজাখুরি কেচ্ছা যত্তোসব। মোটেই বিশ্বাস হয় না নৈমদ্দির। তবু শোনে। প্রচারের সুযোগে দু-একজন মাংনা বিড়ি ফুঁকেই চলে যাচ্ছে, সৌভাগ্যবান এইসব লোকের দিকে জুলজুল ক'রে তাকাচ্ছে সে। অথচ তার দিকে শালাদের নজর পড়ছেই না। নৈমদ্দির কপাল! নিজেকে বড্ড ফ্যালনা মনে হল তার। দাঁড়াবারও তো আর সময় নেই। অন্ধকারে পথ দেখে বাড়ি যেতে পারবে না সে। মরীয়া হয়ে সামনে গিয়ে হাত পাতল। সবাইকেই বেশ বিড়ি দিচ্ছে ভালো; নৈমদ্দির বেলায় কেমন থ্যাঁ-থ্যাঁ করে উঠল। অগত্যা হাত গুটিয়ে পথে নেমে এল। বাড়ি যেতে হবে।

ভীষণ অন্ধকার। দু হাত দূরেও কিছু দেখা যায় না। মনে-মনে প্রকৃতির ওপরই একটু গালিগালাজ করল নৈমদ্দি, যেন এও এক শত্রুতা। সন্ধ্যা না লাগতেই এত ঘন অন্ধকার কি রোজ-রোজ নামে! আবার একটু আফসোসও হল তার, এত দেরি করাটাও বোধ হয় ঠিক হয় নি। এখন আর জোরে পা চালিয়ে লাভ নেই। হুড়মুড় করে পড়ে যেতে পারে। কে একজন তাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে, পায়ের শব্দে টের পেল। এত অন্ধকারেও তার দু-চোখে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন। কাতর কণ্ঠে ডাকল, কিডা গো?

লোকটা একটু দাঁড়াল, তারপর জবাব দিল, নুরুল।

নৈমদ্দি একবার শিউরে উঠল। কিন্তু তার কণ্ঠ থেকে যেন চাপা আর্তনাদ ফুটে বেরুল, 'বাপ নুরুল, আমি তোর বাপ। আন্ধারে বাড়ি যাতি পারছি নি, আমাকে নিয়ি চ।'

নুরুল তার বাপকে চিনেও আঘাত করল, 'হাটের মদ্দি ভিক্ষি করার সুমায় হুঁশ থাকে না, সন্ধ্যি লাগছে, বাড়ি যাতি হবে।'

বৃদ্ধের হাতটা পর্যন্ত ধরল না। দুজনে ধীরে-ধীরে অন্ধকারে সাঁতরে যাচ্ছে। নুরুল আবার কথা তোলে,

'তুমি মোনে কর, আমি কিচ্ছু দেখি নি। সব দেখি, সব দেখতি পাই। ইখানে-উখানে আর ক'দিন থাবা মাইরি থাবা?'

নূরুলের এত শাসন নৈমদ্দির বুকের ভেতরটায় উথাল-পাথাল করে দেয়। জবাব সেও দিতে পারে। তারো চোখ আছে, দিনের আলোয় এখনো সব কিছু দেখতে পায়। এমন-কি কাঁচা ট্যাঁড়শ খাবার কথাটাও সে মুখের ওপর বলে দিতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে আপন ছেলেটার ওপর তার কেমন যেন সহানুভূতি জেগে ওঠে খিধে না লাগলে কেউ কাঁচা পটোল, কাঁচা ট্যাঁড়শ গোগ্রাসে খায়! নৈমদ্দির অনেক কথার বুদ্‌বুদ্ এক অভিমান-বিক্ষুব্ধ হ্রদে এসে মিইয়ে যায়। সে শুধু এইটুকু বলে, 'বাপ নূরুল, আমি কি তোর শত্তুর!'

কিন্তু নূরুলের মধ্যে কোনোই ভাবান্তর নেই। সে পূর্বের মতোই গজরাতে-গজরাতে হাত থেকে জলন্ত বিড়িটা ফেলে দিয়ে অন্ধকারে পথ-নির্দেশের জন্য বাপের হাতটা ধরতে গেল। ওর সহানুভূতি বলতে এইটুকু। এর বেশি নয়। কিন্তু নৈমদ্দি তখন পথের ওপর থেকে ঐ জলন্ত বিড়িটা কুড়াতে প্রায় উবু হয়ে হাত বাড়িয়েছে পথে।

[গল্পটির সংলাপ অংশে কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।]

বাংলাদেশ

ওলে শোইঙ্কা

অভিজিৎ করগুপ্ত

উনিশশো ছিয়াশি সুইডিশ আকাদেমির দ্বিশত-বার্ষিকী উদ্‌যাপনের বছর। নাইজেরিয়ার প্রথিতযশা কবি, নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক আকিন্‌ওয়ান্‌দে ওলুওলে শোইঙ্কাকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করে আকাদেমির বর্তমান সদস্যরা যেন এই দু-শ বছরের ঐতিহ্যের প্রতিই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। নোবেল পুরস্কারও মুক্ত হল দুটি অস্বস্তিকর অপূর্ণতা থেকে—শোইঙ্কা শুধুমাত্র প্রথম আফ্রিকানই নন, কৃষ্ণাঙ্গ দুনিয়াতেও তিনিই প্রথম নোবেলজয়ী লেখক।

এই নিবন্ধে ওলে শোইঙ্কার সাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য দিক—নাটক আর উপন্যাস—নিয়ে আলোচনা করব। এ ব্যাপারে অন্য কিছু প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গও চলে আসতে পারে। কিন্তু সর্বাগ্রে 'ছায়াবৃতা' আফ্রিকার সাহিত্যজগৎ সম্পর্কে একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রাক্‌কথন সংক্ষেপে সেরে নিতে চাই।

ইউরোপ, আমেরিকা এবং কিয়দংশে এশিয়ার সাহিত্যচর্চার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় দীর্ঘদিনের; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে পৌঁছেও আফ্রিকান সাহিত্য সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছ ধারণা আমরা তৈরি করতে পারি নি। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের ক্লাসরুম বা করিডোরে দাঁড়িয়ে কোনো উৎসাহী ছাত্র শোইঙ্কা, চিনউয়া আচিবে, নাদিন গার্ডিমার, লিওপোলড শেঙ্গহর, সেমবেনে ওউসমানে, গ্যাব্রিয়েল ওকারা, মঙ্গোবেতি, আমোস টুটুওলা বা ক্রিসটোফার ওকিগ্‌বোর কবিতা, উপন্যাস অথবা নাটক নিয়ে অধ্যাপক বা সতীর্থের সঙ্গে বিতর্কে মশগুল—এ দৃশ্য নিতান্তই বিরল। বস্তুত আমাদের বিদেশী সাহিত্যের চর্চা এবং প্রীতির এক বিরাট অংশই কামু, সার্ত্র, জয়েস, কাফকা, বেকেট, মিলার, মিলোজ বা ব্রেখ্‌ট্, এলিয়ট, রিলকে, ইয়েট্‌স্-এর পরিচিত চক্রেই এক পর্যাবৃত্ত গতিতে আবর্তিত হয়ে চলেছে। সম্প্রতি কলকাতা থেকে প্রকাশিত এক সারা বিশ্বের কবিতা-সংকলনে শোইঙ্কা, ওকিগ্‌বো বা কোফি আয়োনোয়র-

এর অনুপস্থিতি তাই বিন্দুমাত্র অবাক করে না। আফ্রিকার যথার্থ প্রতিনিধি হিসেবে কাদের বেছে নেওয়া উচিত, সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই অনেকের নেই। শুধু কবিতা নয়—গল্প, উপন্যাস, নাটক এবং প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও একই কথা। কেবল কলকাতা বা ভারতবর্ষই নয়, আফ্রিকান সাহিত্য সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির এই অসম্পূর্ণতা থেকে পশ্চিমী সমালোচকরাও সম্পূর্ণ মুক্ত নন। যুগপৎ অজ্ঞতা এবং উন্নাসিক মনোভাব আফ্রিকান সাহিত্যকে বোঝবার ক্ষেত্রে বারবার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নাইজেরিয়ান লেখক চিনউয়া আচিবের খেদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯৬২ সালে লেখা 'Where Angels Fear to Tread' শীর্ষক প্রবন্ধে আচিবে লিখছেন: We are not opposed to criticism, but we are getting a little weary of all the special types of criticism which have been designed for us by people whose knowledge of us is very limited। অন্ধের হস্তিদর্শনের মতোই আফ্রিকান সাহিত্য বিভিন্ন সমালোচকের কাছে বিভিন্ন অবয়ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। জনৈক সমালোচক খুব সংগত কারণেই বলেছিলেন: African literature has come to mean several things to several people। এইসব বিশ্লেষকদের কারো-কারো কাছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশের সাহিত্য ধরা দিয়েছে কিছু শিক্ষিত মানুষের প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির স্বতন্ত্র সত্তাটিকে বহির্বিশ্বের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস হিসেবে। এঁদের কাছে আফ্রিকান সাহিত্য মানেই দীর্ঘকালের অবদমিত জাত্যভিমানের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আর-একদল আছেন যাঁরা এই মহাদেশের সাহিত্যের মধ্যে প্রতীচীর সমৃদ্ধ সাহিত্যসম্ভারের প্রতিফলন ছাড়া কিছুই দেখতে পান না। যে-কোনো সফল আফ্রিকান লেখক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েই এঁরা ওই লেখকের সাহিত্যের জন্মরহস্য উদ্ঘাটনের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। নাইজেরীয় নাট্যকার জে. পি. ক্লার্ক এঁদের কারো কাছে ধরা দেন গ্রীক ট্রাজেডির প্রতিধ্বনি হিসেবে; কেউ বা ওঁর মধ্যে খুঁজে পান টি. এস. এলিয়টের ছায়া। একজন আফ্রিকান সমালোচকের একটি সরস মন্তব্য থেকে উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। উনি বলছেন: ..... established African writers possess declared or undeclared 'godfathers' while emerging ones are waiting to have the critics announce their forebears। আফ্রিকান সাহিত্যের সমালোচকদের মধ্যে তৃতীয় দলটিই বোধহয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। কালো দুনিয়ার লেখালেখি বলতেই এঁরা বোঝেন বর্ণবিদ্বেষ, সাম্রাজ্যবাদ এবং ঔপনিবেশিকতার শোষণ, অত্যাচার আর বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আফ্রিকায়-জন্ম-নেওয়া কিছু শ্লোগানধর্মী প্রতিবাদী সাহিত্য। সংখ্যায় অল্প হলেও চতুর্থ একটি দল আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন আফ্রিকান সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে একটি নতুন এবং স্বতন্ত্র সাহিত্য ধীরে-ধীরে উঠে আসছে। এঁরা কেউই সম্ভবত সম্পূর্ণ ঠিক বা ভুল নন। জেমস বুথ ওলে শোইঙ্কা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ওঁর মধ্যে বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন যুগের প্রতিভাবান লেখকদের সার্থক প্রতিফলন লক্ষ করে বলেছিলেন: He is an astounding assimilative talent। আফ্রিকান সাহিত্য সম্পর্কেও বোধহয় একই কথা প্রযোজ্য। বুথের ভাষ্যকে একটু বদলে নিয়ে এক্ষেত্রে বলা যায়—এই মহাদেশের সাহিত্যচর্চায় ঐতিহ্য, আধুনিকতা, প্রতিবাদ এবং বহির্বিশ্বের সাংস্কৃতিক প্রেরণা—সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। উৎসাহী পাঠক-গবেষক এই সত্যকে স্বীকার করে অগ্রসর হলেই আফ্রিকার সাহিত্যের রস এবং প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আধুনিক নাইজেরিয়ান সাহিত্য

১৯৬০ সালে নাইজেরিয়ার স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আনন্দ-মুহূর্তে ওদেশের বিখ্যাত পত্রিকা "নাইজেরিয়া"-র একটি বিশেষ স্মারক সংখ্যা প্রকাশিত হয় যার অন্যতম আকর্ষণ ছিল উলি বেইয়ারের লেখা "Nigerian Literature" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ। এই নিবন্ধে সংশ্লিষ্ট আলোচনাকে শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষায় রচিত নাইজেরিয়ান সাহিত্যের মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্য বহু সমালোচক বেইয়ারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ এবং ক্ষোভ প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। অথচ তৎকালীন নাইজেরিয়ান সাহিত্যের উপর আলোকপাত করলে বোঝা যায় যে ত্রুটিমুক্ত না হলেও বেইয়ারের ওই আলোচনা পুরোপুরি যুক্তিহীন ছিল না। প্রায় শতাধিক বিভিন্ন উপজাতির সমন্বয়ে তৈরি নাইজেরিয়ান সমাজে ভাষার সংখ্যাও কম নয়। ভারতবর্ষের মতো নাইজেরিয়াও বহুভাষী দেশ, কিন্তু এক-একটি ভাষাগত জনগোষ্ঠীর সংখ্যাল্পতাই ওদেশের চিত্রকে একটু বেশিমাত্রায় জটিল করে তুলেছে। ইয়োরুবা, এফিক, হাউসা, ইগবো প্রভৃতি ভাষায় সাহিত্যচর্চার প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও একটা কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, দীর্ঘদিনের ইংরেজ শাসনের আড়ালে থেকে নাইজেরিয়ার বিভিন্ন দেশীয় ভাষা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নিজস্ব গতিপথ হারিয়ে ফেলেছিল। স্বাধীন নাইজেরিয়ায় এইসব আঞ্চলিক এবং উপজাতীয় ভাষায় সাহিত্যচর্চা ধীরে-ধীরে প্রসার লাভ করছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো বাধা হল দেশের সামগ্রিক অশিক্ষার হার, এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দেশীয় ভাষায় লেখা সাহিত্যের প্রতি অনীহা। কিন্তু কোনো দেশই সাহিত্যহীন হয়ে থাকতে পারে না—নাইজেরিয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশীয় ভাষার দুর্বলতা থেকে জাত সাহিত্য-শূন্যতাকে ভরাট করার জন্যই এগিয়ে এল ইংরেজি ভাষা। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক: প্রতিটি ক্ষেত্রেই আবির্ভাব ঘটতে লাগল একঝাঁক নতুন মুখের। একে একে উঠে আসতে লাগলেন গ্যাব্রিয়েল ওকারা, আমোস টুটুওলা, টিমোথি আলুকো, সাইপ্রিয়ান একোএনস্কি, চিনউয়া আচিবে, ওলে শোইঙ্কা বা ক্রিস্টোফার ওকিগবোর মতো শক্তিশালী লেখকেরা। ভাষা বিদেশী হলেও এঁদের লেখায় মৌলিকতার কোনো অভাব ছিল না। বস্তুত এঁরাই আধুনিক নাইজেরিয়ান সাহিত্যের প্রথম প্রজন্ম এবং প্রকৃত দিশারি।

পঞ্চাশের দশক আধুনিক নাইজেরিয়ান সাহিত্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সময়। ১৯৫২ সালে আমোস টুটুওলার "দ্য পাম্ ওয়াইন ড্রিংকার্ড" প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। পশ্চিম আফ্রিকার এই ছোট্ট দেশ একলাফে উঠে আসে বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায়। ঠিক দু বছর পরে সাইপ্রিয়ান একোএনস্কি লেখেন "পীপ্‌ল্ অব দ্য সিটি"। এই দশকের শেষ পাদে, ১৯৫৮ সালে, প্রকাশিত হয় আফ্রিকান সাহিত্যের অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস চিনউয়া আচিবের "থিংগ্‌স্ ফল অ্যাপার্ট"। পরের বছর টিমোথি আলুকো প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস "ওয়ান ম্যান, ওয়ান ওয়াইফ"। ওদিকে শোইঙ্কাও বসে ছিলেন না—জীবনের প্রথম দুটি নাটক শুধু লেখা নয়, জিওফ্রে অকসওয়ার্থির মারফত লনডন থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন ইবাদানের আর্ট থিয়েটারে। সেটা ছিল ১৯৫৯ সাল। প্রায় তিন দশক পার করে এসে নাইজেরিয়ার এই ইংরেজি সাহিত্য সত্যিই এখন সৃষ্টি-সফল। ওলে শোইঙ্কাকে বাদ দিলেও এদেশের সাহিত্য আজ আক্ষরিক অর্থেই শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ। এই ক্ষুদ্র পরিসরে সমকালীন নাইজেরিয়ান সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কয়েকজন সফল লেখক সম্পর্কে দু-চার কথা লেখা প্রয়োজন।

টুটুওলা, আচিবে, একোয়েনস্কি এবং আলুকো আগেই উল্লেখিত। এ ছাড়াও আছেন গ্যাব্রিয়েল ওকারা বা ক্রিস্টোফার ওকিগবোর মতো শক্তিশালী

কবিরা। শুধু নাইজেরিয়ারই নয়, আফ্রিকান কবিতার কোনো আলোচনাই এই দুজনকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না। গৃহযুদ্ধের সময় মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে ওকিগবোর মৃত্যু হয়। নাইজেরিয়ান সাহিত্যের পরবর্তী প্রজন্মের কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে আসে জে. পি. ক্লার্ক-এর নাম। শোইঙ্কার মতো ক্লার্কের প্রতিভাও বহুমুখী। "দ্য সংগ অব আ গোট" এবং "ওজিদি" নামের দুটি নাটক ওঁকে পাদপ্রদীপের সামনে নিয়ে আসে। আফ্রিকার সাহিত্যজগতের অন্যতম মুখপত্র "ব্ল্যাক অরফিউস"-এর সম্পাদক হিসাবেও জন পেপার ক্লার্কের সাফল্য সংশয়াতীত। গৃহযুদ্ধোত্তর লেখকদের মধ্যে যে দুজনের কাছে নাইজেরিয়ান সাহিত্য বহুলাংশে ঋণী তাঁদের নাম না উল্লেখ করলে এই ক্ষুদ্র আলোচনাও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এঁরা হলেন যথাক্রমে কোলে ওমোতোসো এবং ফেমি ওসোফিসান। ১৯৭২ সালে শোইঙ্কার বন্দীজীবনের কাব্যময় দলিল "দ্য ম্যান ডায়েড" প্রকাশিত হবার পর কোলে ওমোতোসো অত্যন্ত সততার সঙ্গে স্বীকার করেছিলেন : Soyinka is still Africa's greatest weaver of words। জনপ্রিয় মহিলা-নাট্যকার যুলু সোফোলার কথা না বললে মনে হতে পারে নাইজেরিয়ান সাহিত্য পুরোপুরিই পুরুষশাসিত। প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে অধুনালুপ্ত "দ্য হরন্" পত্রিকার আলোচনায় অন্তত একটি বাক্য ব্যয় করতে চাই। ১৯৮৫ সালে জে. পি. ক্লার্ক এবং মার্টিন বানহাম-এর যৌথ উদ্যোগে ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এই "স্টুডেন্ট পোয়েট্রি ম্যাগাজিন"-এর কাছে আজকের বহু সফল লেখকের ঋণ এক কথায় অপরিসীম।

ওলে শোইঙ্কা : জন্ম, শিক্ষা এবং সাহিত্যচর্চার প্রথম পর্যায়

১৯৩৪ সালের ১৩ই জুলাই আবিওকুটায় শোইঙ্কার জন্ম। 'আবিওকুটা' শব্দের অর্থ 'under the rock' বা 'পাহাড়ের কোলে'। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিচারেই নয়, পশ্চিম আফ্রিকার এই ছোট্ট শহর ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোণ থেকেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। নাইজেরিয়ায় ইংরেজ মিশনারিদের প্রথম কর্মকেন্দ্র এই আবিওকুটা থেকেই ১৮৫৯ সালে ওদেশের প্রথম সংবাদপত্র "Iwe Irohin" প্রকাশিত হয়। এই শহরে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ওলে শোইঙ্কা আসেন ইবাদান ইউনিভারসিটি কলেজে। দু বছর পর চলে যান ইংল্যানডে লীডস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখান থেকেই ১৯৫৭ সালে অনা(র)স সহ ইংরেজি সাহিত্যে বি. এ. পাশ করেন। এর পরও প্রায় তিন বছর ছিলেন ইংল্যানডে। এই সময় কিছুদিন স্ক্রিপ্টরীডারের কাজ করেছিলেন লনডনের রয়্যাল কোর্ট থিয়েটারে। তারপর ১৯৬০ সালের গোড়ায় রকফেলার ফাউনডেশনের ফেলোশিপ নিয়ে ওলে শোইঙ্কা স্বদেশে ফিরে আসেন।

দেশবিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেছেন শোইঙ্কা। দেশে ফিরেই যোগ দেন ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগে। এ ছাড়াও পড়িয়েছেন কেমব্রিজ এবং শেফিলডের মতো বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে। নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধের সময় দু বছর কারারুদ্ধ থাকার পর ১৯৬৯ সালে ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের প্রধানের পদে নিযুক্ত হন। বিয়াফ্রা বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ওলের ভাগ্যে কারাবাস ছাড়াও জুটেছিল নির্বাসন। এই সময় ইওরোপ আর আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন নাটক আর তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে। কিছুদিন ছিলেন ঘানায়। এখানে থাকার সময় "দ্য ট্রান্সজিশন" পত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন শোইঙ্কা। তার পর ১৯৭৬ সালে চলে আসেন ইফে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানেও বিষয় নাটক।

ওলে শোইঙ্কার প্রথম জীবনের সাহিত্যচর্চা

সম্পর্কে কোনো বিশদ আলোচনা বিশেষ চোখে পড়ে নি। এ ব্যাপারে সহায়ক কোনো বই আমি পাই নি। ১৯৭৫ সালে "জারনাল অব আফ্রিকান স্টাডিজ : ২"-তে বারনথ লিনডফরস একটি মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন যার বিষয়বস্তু ছিল ওলে শোইঙ্কার প্রথম জীবনের সাহিত্য। এই প্রবন্ধে তিনি লিখছেন : .....though his (Soyinka's) life and works have been subjected to careful academic scrutiny, no one has given much attention to his early formative period as a writer... । এই প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে, "নাইজেরিয়ান রেডিও টাইমস্"-এ "কেফিস বার্থডে ট্রীট" নামে শোইঙ্কার একটি গল্প ছাপা হয়। সম্ভবত এটিই ওঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। মাত্র ৮৫০ শব্দের এই গল্পে শোইঙ্কা দশ বছরের ছেলে কেফির জন্মদিনে বাড়ি থেকে পালিয়ে চিড়িয়াখানা দেখতে যাবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। অসাধারণ কিছু গল্প নয়, যদিও লিনডফরস এর মধ্যে প্রতিভার উন্মেষ দেখতে পেয়েছেন। ইবাদানে পড়বার সময় শোইঙ্কা কিছুদিন "দ্য ঈগল" নামের একটি ক্যামপাস-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৪ সালে এই মামুলি কলেজ-পত্রিকায় ক্ষুদ্ধ শোইঙ্কার 'রেপটাইলস্' নামের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয় যার ভাষা এবং আঙ্গিকের উৎকর্ষ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মাত্র উনিশ বছর বয়সে এই আফ্রিকান তরুণ লিখছেন : I hate snakes. I hate all reptiles with a hatred that is born of fear.....I would rather face an infuriated bull—then at least, I can see what's coming to me. But a snake, a vile, venomous, slimy, disgusting creature who will strike and disappear before you can say "Jumping Rattlesnakes। এর কিছুদিন পরেই শোইঙ্কা ইংল্যানডে চলে আসেন।

নাটক

প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রকাশক রেক্স্ কলিংস্ শোইঙ্কার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন : Soyinka is something of a universal man : poet, playwright, novelist, critic, lecturer, actor, translator and publisher. He is all of these। এই তালিকায় আরও দুটি বিশেষণ যুক্ত হতে পারে—নাটক আর চলচ্চিত্র পরিচালনা। সম্প্রতি এক রবিবারের সকালে ব্রিক্স্টনের একটি প্রেক্ষাগৃহে শয়ে-শয়ে আফ্রিকান এবং ক্যারিবিয়ান দর্শক জমা হয়েছিলেন ওলের সঙ্গোনির্মিত ছবি "ব্লুজ ফর আ প্রোডিগাল" দেখবার জন্য। এত বৈচিত্র্য, এত বিপুল কর্মক্ষমতা এবং বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হলেও আফ্রিকার এই অবিস্মরণীয় মানুষটির সৃজনী শক্তির সম্যক পরিচয় পেতে অনিবার্যভাবেই আমাদের হাত বাড়াতে হবে ওঁর নাট্যসাহিত্যের দিকে। বস্তুত নাটকেই শোইঙ্কার প্রতিভার গভীরতা এবং ব্যাপ্তির সঠিক পরিচয় মেলে।

ছাত্রাবস্থায় লীডসে থাকার সময় থেকেই শোইঙ্কার সাহিত্যপ্রীতির একটা বিরাট অংশ কেড়ে নেয় নাটক। এখানেই তিনি ব্রিটেনের খ্যাতনামা নাট্যসমালোচক উইলসন নাইটের সংস্পর্শে আসেন। লীডস থেকে লনডনে আসেন ১৯৫৭ সালে, এবং সম্ভবত এক বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণ করেন জীবনের প্রথম দুটি নাটক "দ্য লায়ন অ্যাণ্ড দ্য জুয়েল" ও "দ্য সোয়াম্প ডোয়েলার্স" রচনার কাজ। ১৯৫৮ সালের সেপটেমবর মাসে লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্য-উৎসব উপলক্ষে 'স্টুডেনট মুভমেনট হাউস'-এ প্রথম অভিনীত হয় "দ্য সোয়াম্প ডোয়েলার্স"। শোইঙ্কা নিজেও এখানে অভিনয় করেছিলেন। পরের বছর ১৯৫৯ সালের ২০শে এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি, ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিওফ্রে

অক্সওয়ার্থির উদ্যোগে ইবাদান আর্ট থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় "দ্য সোয়াম্প ডোয়েলার্স" এবং "দ্য লায়ন অ্যাণ্ড দ্য জুয়েল"। ১৯৫৮-র শরৎকালে লনডনের রয়্যাল কোর্ট থিয়েটারে স্ক্রিপট রীডারের কাজ পান শোইঙ্কা। রয়্যাল কোর্টে প্রায় আঠারো মাস কাজ করেছিলেন। এই সময় খ্যাতনামা নাট্যকার, পরিচালক এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সান্নিধ্য ওঁর নাট্যবোধকে সঠিক অর্থেই পরিশীলিত এবং বলিষ্ঠ বরে তোলে। ১৯৫৯ নালে রয়্যাল কোর্ট থিয়েটারে অভিনীত হয় ওলের একাঙ্ক নাটক "দ্য ইনভেন্‌শান্‌"। ইতিমধ্যেই শোইঙ্কা ইংল্যানড এবং নাইজেরিয়া দু-দেশেই উদীয়মান নাট্যকার হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছেন। ১৯৬০ সালের গোড়ায় তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন তখন আক্ষরিক অর্থেই এই কৃষ্ণাঙ্গ যুবক পেরিয়ে এসেছেন খ্যাতি আর জনপ্রিয়তার প্রথম সোপান।

শোইঙ্কা ইংল্যানড থেকে দেশে ফিরেছিলেন রক্‌ফেলার ফাউনডেশনের ফেলোশিপ নিয়ে। এই ফেলোশিপের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী নাটক। ইবাদানে এসে এই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করতে একটুও দ্বিধা করেন নি তিনি। শুধুমাত্র নাটক রচনাই নয়—পরিচালনা, অভিনয় এবং নতুন প্রতিভা অন্বেষণের ক্ষেত্রেও এই মানুষটির দক্ষতা অনস্বীকার্য। আধুনিক নাইজেরিয়ান নাটক ওলে শোইঙ্কার কাছে বহুলাংশে ঋণী। ই. ডি. জোনস বলছেন: Soyinka's dream for Nigerian theater is similar to that of Yeats for Irish theater. It is to produce a theater which has its roots in the Nigerian tradition। সম্ভবত এই স্বপ্নকে সামনে রেখেই প্রথমে "দ্য ১৯৬০ মাস্‌ক্‌স্‌" এবং তারপর "ওরিস্‌ন" নামে দুটি নাটকের দল তৈরি করেন। এই সময় কেবল নিজের নাটক নিয়েই ব্যস্ত থাকেন নি, একই সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নাইজেরিয়ার নাট্যজগতের নতুন প্রজন্মের দিকে। ব্যারি বেকর্ড, সারিফ ইস্‌মন্‌, জে. পি. ক্লার্ক প্রমুখ নাট্যকারদের নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে শোইঙ্কার উৎসাহ এবং উদ্যোগকে অস্বীকার করার উপায় নেই। এ ছাড়াও আছেন পরিচালক দাপো আদেলুগবা এবং নাট্যকার ওয়ালে ওগুনিয়েমি। ওগুনিয়েমি প্রথমে অভিনেতা হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। শোইঙ্কার উৎসাহ এবং অভিভাবকত্বেই শুরু করেন নাটকরচনার কাজ। এই বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে, দেশে ফেরার মাত্র এক বছরের মধ্যেই শোইঙ্কা উঠে আসেন উল্কার ক্ষিপ্রতা নিয়ে। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে, তৎকালীন আফ্রিকার অন্যতম জনপ্রিয় পত্রিকা "ড্রাম"-এ শোইঙ্কার উপর লেখা একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপা হয়। শিরোনাম ছিল: Young dramatist is earning the title of Nigeria's Bernard Shaw। শোইঙ্কা তখন সাতাশ বছরের যুবক।

দু দশকের কিছু বেশি সময় ধরে প্রায় কুড়িটি নাটক লিখেছেন শোইঙ্কা। প্রকাশিত হয়েছে চোদ্দটি। প্রতিটি নাটকের চুলচেরা বিশ্লেষণ এই ক্ষুদ্র পরিসরে সম্ভব নয়। তবু চেষ্টা করব একটা সুসংহত চিত্র তুলে ধরার। সমালোচকরা শোইঙ্কার নাটকে গ্রীক ট্রাজেডির যুগ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর অ্যাবসার্ড ড্রামা পর্যন্ত সব সময়েরই বহু কালজয়ী নাট্যকারের প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এই প্রভাব অনুপ্রেরণার গণ্ডি পেরিয়ে অনুকরণে নেমে আসে নি। ওলে শোইঙ্কা আজ শুধু আফ্রিকারই নয়, সারা পৃথিবীরই নাট্যসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচক ই. ডি. জোনসের মতে: Coming to Wole Soyinka from Shakespearian criticism is excellent preparation if only because it puts us on our guard against to fit him into preconceived patterns। একই প্রবন্ধের অন্যত্র জোনস লিখছেন: Shakespearian criticism requires an informed but open mind. The critic of Soyinka should approach him in a similar way; equipped, but open। এরপর শোনা যাক নিজের নাট্যরীতি সম্পর্কে ওলের নিজস্ব মতামত। যাটের দশকের প্রথম দিকে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গিয়ে শোইঙ্কা বলছেন: ...if I wanted to aim at any particular kind of theater, I think, however subconciously, I might aim at Brecht's kind of theater which I admire tremendously, just his complete freedom with medium of theater।

এবার সরাসরি প্রবেশ করছি ওলে শোইঙ্কার নাটকে। প্রথমেই বেছে নিচ্ছি ওঁর জীবনের প্রথম মঞ্চস্থ নাটক "দ্য সোয়াম্প ডোয়েলার্স"। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ লগ্নে এসে আফ্রিকার সমাজ আর জীবনযাত্রা এক দুরন্ত দ্বন্দ্বের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল ওই সময়—হয়তো আজও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। একদিকে উপজাতীয় কুসংস্কার, গ্রাম্য অজ্ঞতা এবং ধর্মীয় অনুশাসনের বিধিনিষেধ, আর অন্যদিকে পশ্চিমী সভ্যতার অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রবেশ থেকে আসা নগর-সভ্যতা। নাটক রচনার সূচনাপর্বেই শোইঙ্কা বেছে নিলেন একটি জটিল বিষয়কে। আমরা পেলাম একটি দুর্ধর্ষ নাটক। "দ্য সোয়াম্প ডোয়েলার্স"-এর মূল চরিত্র ইগ্‌ওয়েজুর ব্যর্থতা, হতাশা, গ্লানি বা রাগ কোনো আঞ্চলিক ব্যাপার নয়। নাইজেরিয়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামের পটভূমিতে দাঁড়িয়েও সে আমাদের দিকে ছুঁড়ে দেয় এক ঐতিহাসিক সত্যকে। অতিবর্ষায় ইগ্‌ওয়েজুর জমি চাষের অযোগ্য হয়ে উঠেছে—ফসল ফলাবার সমস্ত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সে শহরে আসে। এখানে ইগওয়েজু সঞ্চয় করে আর-এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা: তারই যমজ-ভাই তাকে সর্বস্বান্ত করেই ক্ষান্ত হয় না, বউকে পর্যন্ত হাতিয়ে নেয়। ব্যথিত হৃদয়ে সে ফিরে আসে গ্রামে। এখানে এসেই তার যাবতীয় রাগ গিয়ে পড়ে গ্রাম্য পুরোহিত দুর্নীতিগ্রস্ত কাদেইয়ের উপর। ইগ্‌ওয়েজুকে আমরা পাই এক সর্বাত্মক পটভূমিতে। যদিও এ নাটকে সে একজন বঞ্চিত আফ্রিকান কৃষক। ই. জি. জোনস বলেছেন: All aspects of life under the sun are portrayed in this short play। 'দ্য সোয়াম্প ডোয়েলার্স' নাটকের বৃদ্ধ ভিক্ষুক চরিত্রের মধ্য দিয়ে ইগওয়েজুকে আশার আলো শুনিয়েছেন লেখক—কিন্তু সে তো অন্ধ। ভাগ্যান্বেষণের জন্য দ্বিতীয় বার গ্রাম থেকে শহরে যাবার আগে ইগওয়েজু ওই অন্ধ ভিখারিকেই তার খামারে রেখে যায়। যাবার সময় বিপর্যস্ত নায়কের মুখ দিয়ে শোইঙ্কা বলান: Only the children and the old stay here, bondsman. Only the innocent and the dotards। ইগওয়েজু গফুর আর আমিনাকে চেনে না—চিনলে নিশ্চয়ই এ কথা বলত না। কিন্তু কেন ইগওয়েজুরা চলে যায়? জেরাল্ড মূর সম্ভবত ঠিকই ধরেছেন: For them the attraction of the city is as much negative as positive,...If the city destroys every obligation of kinship and friendship, as Igwezn has already learnt, it also destroys the kind of sanctified exploitation represented by the kadiye.

'দ্য লায়ন অ্যানড দ্য জুয়েল' শোইঙ্কার নাট্যজীবনের একটি বিতর্কিত সৃষ্টি। জনপ্রিয়তার দিক দিয়েও এই নাটকের সাফল্য প্রশ্নাতীত। 'দ্য লায়ন অ্যানড দ্য জুয়েল'-এর জন্যই লনডনের এক সমালোচক ওলেকে চিহ্নিত করেছিলেন 'প্রতিক্রিয়াশীল' হিসেবে, আবার এই নাটকের দিকে তাকিয়েই ব্রুস কিং উচ্ছ্বসিত গলায় বলেছিলেন: 'The Lion and the Jewel' seems to me the best literary work to come out of Africa। একদিকে পশ্চিমী শিক্ষায় আপ্লুত গ্রাম্য শিক্ষক লাকুনলের প্রেম আর অন্যদিকে ঐতিহ্য ও সাবেকি জীবনযাত্রার

প্রতিভূস্থানীয় উপজাতীয় গোষ্ঠীপ্রধান, দুর্নীতি-পরায়ণ বৃদ্ধ বারোকার লালসা। এরই মাঝে শোইঙ্কা এনে দাঁড় করালেন এক রূপসী গ্রাম্য তরুণী সিদির অন্তরদ্বন্দ্বকে। প্রথমে সে লাকুনলেকেই বেছে নিয়েছিল। কিন্তু নাটকের শেষে আমরা দেখি এই আধুনিক যুবককে অস্বীকার করে সিদি চলে যায় বারোকার কাছে। "দ্য লায়ন আনড দ্য জুয়েল" সম্পর্কে সমালোচকদের মূল্যায়ন অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট। মার্টিন এসলিন এই নাটকে খুঁজে পেয়েছেন upholders of the past tradition-এর প্রতি শোইঙ্কার দুর্বলতা। কেনিয়ার বিখ্যাত লেখক নাগুগি আবার উৎফুল্ল বোধ করেন এই ভেবে যে, Soyinka portrays the ineffectuality of the intellectual in sexual term। এইসব সমালোচকদের বৈদগ্ধ্যের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেই বলতে চাই, এই নাটকে শোইঙ্কার বক্তব্য আরও গভীর—আরও ব্যাপক। অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত সমালোচক ক্রোনেনস্কিলড-ই সম্ভবত উপলব্ধি করতে পেরেছেন শোইঙ্কার অন্তরদৃষ্টিকে : 'The Lion and the Jewel' depends on seeing humans in terms of their universal motivations of pride, power and sex, which culture provides various means of satisfying, not in terms of their allegiance to old or new cultural values per se। নাটকের শেষ লগ্নে এসে লাকুনলের মুখ দিয়ে আমরা শুনতে পাই এক অসাধারণ সংলাপ। বৃদ্ধ বারোকার কাছে কুমারীত্ব খুইয়েও সিদির কোনো গ্লানি নেই—বরং এই ষাটোর্ধ্ব গোষ্ঠীনেতার কাছেই সে পেয়েছে এক শারীরিক তৃপ্তির স্বাদ। বিভ্রান্ত লাকুনলে সিদিকে বলছে : I will not let you, I will protect you from yourself। প্রশ্ন জাগে সিদি-র কোন্ 'self' থেকে লাকুনলে সিদিকে বাঁচাতে চায়? আদিম যৌন চাহিদা? কুসংস্কারঘেরা আফ্রিকার প্রাচীন ঐতিহ্য? নাকি অন্যকিছু?

নাইজেরিয়ার স্বাধীনতা উপলক্ষে ১৯৬০ সালের অকটোবর মাসে লাগোসের ইয়াবা (Yaba) টেকনিকাল কলেজে প্রথম অভিনীত হয় 'আ ডানস ইন দ্য ফরেসট"। শুধুমাত্র নাইজেরিয়া নয়, এই নাটকে শোইঙ্কা ব্যবচ্ছেদ করতে চেয়েছেন আফ্রিকার সামগ্রিক অস্তিত্বকে। ওই মহাদেশের বর্তমান, ভবিষ্যৎ, এমনকি গৌরবজনক ঐতিহ্যবাহী অতীত—সবকিছুই ওলের চোখে ধরা দিয়েছে বিবর্ণ অন্ধকারময় এক-একটি অধ্যায় হিসেবে। শুধু আফ্রিকা নয় এ নাটকে আমরা দেখতে পাই সমকালীন পৃথিবীর দেশে-দেশে সংঘটিত অত্যাচার, ভণ্ডামি আর আত্মবিক্রয়ের নগ্নচিত্র। ও আর ডথর্ন বুঝতে পারেন নি : Whether 'A Dance in the Forest', ...is a work of genius ; or the magnificient ruins of lofty intentions। কিন্তু আমরা জানি লনডনের "Encounter" পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত নাট্যপ্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত এই নাটকে ওলে শোইঙ্কা অতিমাত্রায় সফল।

শোইঙ্কার ট্রাজিক নাটকে 'মৃত্যু' আসে মানুষের কমপিউটারাইজড আধুনিক সত্তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষটিকেও বিবশ করে দিতে। "স্ট্রং ব্রীড" নাটকে কিশোর ইফাদাকে বাঁচাবার জন্য ইমান-এর আত্মত্যাগের বিচলিত হলেও আমরা অবাক হই না। শুধুমাত্র আফ্রিকার উপজাতি-অধ্যুষিত গ্রাম্য জীবনের আদিম কুসংস্কারের দর্পণ হিসেবে এ নাটককে চিহ্নিত করলে ভুল করা হবে—আজকের সভ্য দুনিয়াতেও 'স্ট্রং ব্রীড' অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক। কেন ইমান মৃত্যু বরণ করল? শোইঙ্কা আমাদের নিয়ে যান এক আফ্রিকান গ্রামে—যেখানে প্রতি বছর বর্ষ-শুরুর দিন সদ্য-অতিক্রান্ত বৎসরের যাবতীয় পাপকে দূর করার জন্য একজন বহিরাগতকে হত্যা করা হয়। এ এক অজুহাত মাত্র। ইমানদের চিরদিন এইভাবেই চলে যেতে হয়। 'স্ট্রং ব্রীড' সম্পর্কে জেরালড মূরের বক্তব্য : This is the only one of Soyinka's play which deals specifically with the theme of the scapegoats। ইমানকে বলির পাঁঠা হিসেবে ভাবতে অবাক লাগে, কষ্ট হয়—বরং পুলকিত হই যখন নগুগি ইমানকে 'Christ-like figure' বলে অভিহিত করে ওঁর মধ্যে শিল্পীর সংবেদনশীলতা আবিষ্কার করেন, উৎফুল্ল হই যখন মার্টিন এসলিন ইমানকে On the side of the new ideas বলে বর্ণনা করেন।

লাগোসের নিকটবর্তী এক রাজপথকে পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়ে শোইঙ্কা লিখলেন এক ভিন্নধর্মী নাটক—'দ্য রোড'। এ নাটকে আমরা পাই রকমারি মানুষকে। কেউ-বা ট্রাক ড্রাইভার, কেউ-বা দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ। নাটকের মূল স্রোত অবশ্যই বয়ে গেছে একজন আপাত-উন্মাদ অধ্যাপককে কেন্দ্র করে—দুর্ঘটনা বা মৃত্যুই যার জীবিকার উপায়। বারনথ লিনডফরস 'দ্য রোড'কে an intriguing enigmatic work বলে বোধহয় খুব ভুল করেন নি। অর্থহীন অস্তিত্বের মাঝে মৃত্যুর যুক্তিগ্রাহ্যতাই সম্ভবত এ নাটকের উপজীব্য বিষয়।

'আ ডানস ইন দ্য ফরেসট' থেকে শোইঙ্কার নাটকে ইয়োরুবা পুরাণের যে প্রভাব কখনো সুপ্ত কখনো বা প্রচ্ছন্ন ভাবে আবির্ভূত হয়েছে 'কোংগিজ হারভেসট'-এ এসে আমরা তাকে এক অসাধারণ ব্যঞ্জনায় মূর্ত হতে দেখি। এই নাটকের মধ্য দিয়ে উপজাতীয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ক্লান্ত নাইজেরিয়া তথা সমগ্র আফ্রিকার দিকে ওলে ছুঁড়ে দিলেন এক নির্মম স্যাটায়ার। একই সঙ্গে তুলোধোনা করলেন অতীত আর বর্তমানের স্বৈরাচারী শাসকশ্রেণীকে। কল্পিত রাষ্ট্র ইসমার প্রেসিডেন্ট কোংগি এবং আধ্যাত্মিক নেতা ইয়োরুবা শাসক দানলোনার সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে শোইঙ্কা কোন্ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হলেও আজও আফ্রিকা মুক্তি পায় নি কোংগিদের হাত থেকে।

বিষয় পৃথক হলেও শোইঙ্কার জেরো নাটক দুটিও (Trial of Brother Jero এবং Jero's Metamorphosis) দুটি সফল স্যাটায়ার। একই প্রেক্ষাপটে ওলে চিরতে চেয়েছেন ধর্মীয় নেতাদের মুখোশ আর আফ্রিকার উদাসীন, ক্লীব এবং অপদার্থ বুদ্ধিজীবীদের। এ নাটক সম্পর্কে ই.ডি. জোনসের ভাষ্য থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় নাট্যকারের ক্ষমতার পরিধি : Soyinka had flirted with Jero in the way Shakespeare had flirted with Falstaff and Autolycus, and Ben Johnson with Face।

শোইঙ্কার নাট্যজীবনের অষ্টম রচনা "ম্যাডম্যান অ্যানড স্পেশালিসট" প্রকাশিত হবার পর নাইজেরিয়ান সমালোচক আবিওলা ইরেলে লাগোসের "সানডে টাইমস"-এ লিখলেন ; a nightmarish image of our collective life as it appears to a detached and reflexive conciousness। বস্তুত গৃহযুদ্ধে পঙ্গু নাইজেরিয়ার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে, দীর্ঘদিনের কারাবাস এবং নির্বাসনের অভিজ্ঞতায় সম্পৃক্ত শোইঙ্কার হাত দিয়ে বেরিয়ে এল যে নাটক তাকে দুর্নীতি, কুসংস্কার আর অজ্ঞতার আশ্চর্য চিত্রকল্প বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে 'ম্যাডম্যান অ্যানড স্পেশালিসট" অবশ্যই কিছুটা অ্যাবসার্ডধর্মী।

সত্তরদশকের মাঝামাঝি প্রকাশিত 'ডেথ অ্যানড কিংস হর্সম্যান' মূলত ট্রাজিক নাটক। প্রচলিত বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক 'ইয়োরুবা' ভূস্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর ঘোড়সওয়ার Elesin oba-কেও সহমরণে যেতে হয়। এই উপজাতীয় লোকাচারকেই শোইঙ্কা নিয়ে এসেছেন সমকালীন প্রেক্ষাপটে। এ নাটকের পটভূমি নাইজেরিয়ার প্রাচীন ইয়োরুবা শহর Oyo, সময় ১৯৪৬। এখানে আমরা দেখি এক ঔপনিবেশিক

জেলা-অধিকর্তা একজন ঘোড়সওয়ারকে বাধা দিচ্ছেন অনুরূপ সহমরণে যেতে। কিন্তু এই প্রাচীন ঐতিহ্য-পূর্ণ (!) লোকাচারকে ঠেকানো যায় না। ঘোড়সওয়ারের অকৃত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে আত্মাহুতি দেয় তারই 'Western educated' ছেলে। 'Death and King's Horseman'-কে শোইঙ্কা নিজেই 'the conflict of cultures' হিসেবে ব্যাখ্যা না করার জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন।

ওলে শোইঙ্কার নাটক নিয়ে আলোচনা আর দীর্ঘ করতে চাই না। শেষ লগ্নে এসে প্রথমেই উল্লেখ করছি অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত কয়েকটি নাটকের নাম। সকল সৃষ্টির আড়ালে পড়ে গেলেও "কামউড অন দ্য লিভস্", "দ্য নিউ রিপাবলিক" বা "বিফোর ব্ল্যাক-আউট"ও আলোচিত হওয়ার যোগ্য। লনডনের ন্যাশনাল থিয়েটারের আমন্ত্রণে শোইঙ্কা আমাদের উপহার দিয়েছিলেন "দ্য বাখায়ে অব ইউরিপিদেস" —গ্রীক ট্রাজেডির আফ্রিকান ব্যাখ্যায় মদ্যপ দেবতা ডাওনিসাসকে আমরা ওলের হাতে এসে রূপান্তরিত হতে দেখি এক ত্রাণকর্তার ভূমিকায়। গ্রীক দেবতার শরীর চিরে শোইঙ্কা ভরে দিয়েছেন ইয়োরুবা পুরাণের অন্যতম দেবতা ওগানের গুণাবলী।

শোইঙ্কার নাটকে সমগ্র আফ্রিকা, বিশেষ করে ওঁর স্বদেশ নাইজেরিয়া এক নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। নাইজেরিয়ার ঐতিহ্য আর প্রকৃতির প্রতিটি অণুপরমাণু ওঁকে অনুপ্রাণিত করে—সেদেশের ইতিহাস, সাংস্কৃতিক আর ধর্মীয় ঐতিহ্য, ভৌগোলিক প্রাচুর্য এবং আধুনিক জীবনের জটিলতা বারবার মূর্ত হয়ে ওঠে ওঁর সৃষ্টিতে। বস্তুত ওলে শোইঙ্কার মতো আর কোনো আফ্রিকান লেখকের সৃষ্টিতেই এত সার্থকভাবে ধরা পড়ে নি ওই মহাদেশের অন্তরাত্মা আর জীবনবোধ। স্বদেশের বাইরে আফ্রিকার দৃষ্টিতে মানবিকতাকে উপলব্ধি করানোর ক্ষেত্রে ওলে শোইঙ্কাই নিঃসন্দেহে সফলতম শিল্পী। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কৃষ্ণকায় মানুষটির জীবন আর চিন্তা কখনোই সংকীর্ণ আঞ্চলিকতার চোরাবালিতে আটকে পড়ে নি। প্রকৃত অর্থেই উনি বিশ্বমানব। ওঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় মানুষ। কখনো সামাজিক, কখনো রাজনৈতিক, কখনো-বা পৌরাণিক পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে মানুষকে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে। শোইঙ্কার সাহিত্যালোচনায় বসে ই. ডি. জোন্‌স্ খুব সংগত-ভাবেই বলেছিলেন : His concern is with man on earth. Man is dressed for the nonce in African dress and lives in the Sun and the tropical forest, but he represents the whole race।

উপন্যাস

১৯৬২ সালের অগস্ট মাসে লুইন্‌কোসির নেওয়া এক সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, ওই সময় ওলে শোইঙ্কা তাঁর জীবনের প্রথম উপন্যাস রচনার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। তিন বছর পর, ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় "ইনটারপ্রিটারস"—ওলের প্রথম উপন্যাস। এর আগে আফ্রিকান সাহিত্যের পাঠকরা পরিচিত হয়েছেন আমোস টুটুওলার 'The Palm Wine Drinkard' (১৯৫২); নাদিন গার্ডিমারের 'A World of Strangers' (১৯৫৩) 'Occasion for Loving' (১৯৬৩); আচিবের 'Things Fall Apart' (১৯৫৮), 'Arrow of God' (১৯৬৪); সেমবেনওউসমেনের 'Les Bouts de Bois Dieu' (১৯৬০) প্রভৃতি শক্তিশালী এবং বিখ্যাত উপন্যাসের সঙ্গে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অধ্যাপক জেরালড মূর "The New African" পত্রিকায় 'ইনটারপ্রিটারস' নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করলেন : The first African novel that has a texture of real complexity and depth। মূরের এই মূল্যায়ন নিয়ে বিতর্কের ঝড় তোলা যেতে পারে—বিশেষ করে যখন জানা যায় যে এই ভদ্রলোক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওলে সম্পর্কে এক স্ববিরোধী বাতাবরণ তৈরি করেন আমাদের সামনে। ওসব তর্কে না গিয়েও বলা যায় যে, "ইনটারপ্রিটারস"-এর মধ্য দিয়ে গোটা মহাদেশের সাহিত্যজগৎ এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন প্রত্যক্ষ করেছিল। এতকাল ওলের পরিচয় ছিল প্রধানত নাট্যকার হিসেবে। এবার তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হল আরও একটি বিশেষণ। আক্ষরিক অর্থেই পৌঁছে গেলেন তিনি পাদপ্রদীপের একেবারে সামনে।

"ইনটারপ্রিটারস" নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে এই বহু-আলোচিত উপন্যাস সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব মতামত তুলে ধরছি। ১৯৬২ সালে লুই ন্‌কোসিকে শোইঙ্কা বলছেন : I think really this is where my feeling of a sort of personal relationship canibalism comes pretty much to the fore; in the novel. In fact that's the main thing I can say about it।

"ইনটারপ্রিটারস্"-এর কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার বিবৃত করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। ঘটনার স্রোত এতই জটিল এবং বহুমুখী যার সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা তৈরি করতে গেলেও অনেক কথা বলতে হয়। উপন্যাসের বহু চরিত্রের মধ্য থেকে ধীরে-ধীরে আমাদের সামনে একটি গতিশীল কেন্দ্রবিন্দু তৈরি হতে থাকে। ছ-জন নাইজেরীয় যুবক, বা আরও ভালোভাবে বলতে গেলে তাদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, তদুপরি এদের হতাশা, যন্ত্রণা, ব্যর্থতা বা সাফল্যের মধ্য দিয়ে জন্ম-নেওয়া জীবনবোধ এবং উপলব্ধি, আমাদের চালিত করে ওই গতিশীল কেন্দ্রবিন্দুর পিছু নিতে। এরা পরস্পরের বন্ধু বা ব্যাপক অর্থে একে অন্যকে চেনে। সদ্য-স্বাধীন নাইজেরিয়ান সমাজের অগ্রণী অংশের প্রতিনিধি এই ছয় যুবক পেশায় বুদ্ধিজীবী। সাগোয়ে একজন সাংবাদিক, বানদেলে এবং কোলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সেকোনি একাধারে ইনজিনীয়র এবং শিল্পী, এগবো বিদেশ দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার এবং লাস্নুনওন একজন আইনজীবী। ষাটের দশকের প্রথমার্ধে দাঁড়িয়ে, দীর্ঘদিনের বিদেশী শাসন থেকে সদ্যোমুক্ত একটি আফ্রিকান রাষ্ট্রের শিল্পসংস্কৃতি, শিক্ষা অথবা গণমাধ্যম থেকে শুরু করে দেশের প্রযুক্তি, উন্নয়ন, আইন, এমনকি বৈদেশিক বিভাগ—সর্বত্রই এদের কেউ না কেউ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুত একটি পশ্চাৎপদ দেশের বহু চাহিদার এরাই যথার্থ প্রতিভূ। এরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট পরিমাণে আত্মসচেতন এবং নিজ-নিজ কেরিয়ার নিয়ে ভাবিত। লাগোস বা ইবাদানের নাইটক্লাবে এসে মাঝে-মাঝে গল্প করা বা আড্ডা মারার সময় এরা নিজেদের কর্মস্থলের অথবা জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এবং প্রতিক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করে অন্যদের কাছে। আসলে ওই সময়ের নাইজেরিয়ান সমাজের সুপারস্ট্রাকচারকে এরা নিজেদের জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধির আলোয় ইনটারপ্রিট করতে চাইছে আমাদের সামনে—যে অভিজ্ঞতা এই ছয় যুবক সঞ্চয় করেছে নিজেদের আবেগ, কল্পনা, ইগো এবং সর্বোপরি আত্মসচেতন ব্যক্তি-অস্তিত্বের সঙ্গে সমাজের নির্মম বাস্তবতার প্রতিক্রিয়াজাত নির্যাস থেকে। "ইনটারপ্রিটেশন" বা ব্যাখ্যার আলোতেই আমরা শুনতে পাই এক আফ্রিকান রাষ্ট্রের হৃৎস্পন্দনকে। এই উপন্যাসের কাহিনী-অংশকে বোধহয় অল্প কথায় সবচেয়ে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন বার্‌ন্থ লিন্‌ডফর্‌স্। ওঁর ভাষায় : Together or alone, in unison or at odds, these six intellectuals interpret and reinterpret their experiences and the world in which they live, leaving the reader to interpret the interpreters and their interpretations।

জীবনের প্রথম উপন্যাসেই শোইঙ্কা একই সঙ্গে অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে চিরাচরিত ধারার অভিমুখকে অস্বীকার করে বিকশিত হতে চেয়েছেন এক সর্বার্থক নিজস্বতায়—অবশ্যই আফ্রিকার পরিপ্রেক্ষিতে।

প্রথমত "ইনটারপ্রিটারস"-এ কোনো মুখ্য চরিত্র বা নায়কনায়িকা নেই। পূর্বোক্ত ছজন যুবককে ঘিরে কাহিনীর মূল স্রোত গড়ে উঠলেও এরা কেউই উপন্যাসের মেরুদণ্ড নয়। বরং এদের মিলিত সত্তাই একাকার হয়ে এক নতুনতর স্বাদ সৃষ্টি করে। অবশ্য এই ছজন বুদ্ধিজীবীর প্রত্যেকেই নিজস্ব বৃত্তে এক-একটি আপাত-সম্পূর্ণ চরিত্র, অন্যরা সেখানে পার্শ্ব-চরিত্রের ভূমিকায় উপস্থিত, কিন্তু উপন্যাসের বৃহত্তর পরিধির আওতায় এসে এরা সবাই এক-একটি উপাদান চরিত্রে পর্যবসিত হয়ে যায়। "ইনটারপ্রিটারস" পড়তে বসে মুখ্য চরিত্র খুঁজতে বসা নিতান্তই পণ্ডশ্রম। কাহিনী বা ঘটনার প্রেক্ষাপট বদলাবার সঙ্গে-সঙ্গে কেন্দ্রীয় চরিত্রও বদলে যায়—সম্পূর্ণ এক নতুন অধ্যায়ে আমরা প্রবেশ করি।

এই উপন্যাসের একটি বৈশিষ্ট্য হল এর ভাষা। ই. ডি. জোনস লিখছেন : 'The Interpreters' was written by a poet···the novel itself is an extended metaphor। উপন্যাস লিখতে বসে শোইঙ্কা ভুলতে পারেন নি নিজের কবিসত্তাকে। এক-একটি মুহূর্ত তৈরি করেছেন যেন এক-একটি শব্দ দিয়ে। জোনসের ভাষ্য আবারও মনে পড়ছে : It is tightly written, giving the impression of having been totally conceived before the first word was set down। ভাষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট নিদর্শন বোধহয় সেকোনির সংলাপ। ওর তোতলামিকে শোইঙ্কা ভাষ্যরূপ দিয়েছেন অনবদ্য মুনসিয়ানায়। এই উপন্যাসের দৌলতে ইংরেজি ভাষার অভিধানে কিছু নতুন শব্দও সংযোজিত হয়ে গেছে।

উপন্যাস লিখতে গিয়ে শোইঙ্কা প্রথাগত বর্ণনাভঙ্গি মানতে রাজি হন নি। ঘটনাবিন্যাসের কোনো ধারা-বাহিকতা নেই। ইনটারপ্রিটারস শুরু হচ্ছে মূল ঘটনা প্রবাহের মধ্যবর্তী অংশ থেকে এবং এখানে দাঁড়িয়েই ওলে আমাদের ছুঁড়ে দিচ্ছেন অজানা অতীতে। চরিত্রদের আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন কোনোরকম প্রাকপ্রস্তুতির সুযোগ না দিয়েই। উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের রকমারি অনুভূতি এবং সত্তাকে শোইঙ্কা প্রতিষ্ঠা করছেন কখনো পিছু হটে, কখনো বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে। ক্ষেত্রবিশেষে এক অতিমাত্রায় নিজের স্টাইলে পাঠককে টেনে নিচ্ছেন ভবিষ্যতের দিকে।

"ইনটারপ্রিটারস'এ শোইঙ্কা শুধুমাত্র আধুনিক নাইজেরিয়ান সমাজকেই দেখাতে চান নি সম্ভবত আরও ব্যাপক এর আবেদন। আমার মনে হয়, এব্যাপারেও অধ্যাপক জোনসের সঙ্গে একমত হতে বাধা নেই। উনি বলছেন : Events all over the world have shown in the new generation a similar dissatisfaction with what to them is a facade concealing a rotten structure. Thus Soyinka, using a Nigerian setting, has portrayed a universal problem।

শোইঙ্কার দ্বিতীয় উপন্যাস "সীজন অব অ্যানোমি" প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। 'ইনটারপ্রিটারস' এবং সীজন অব অ্যানোমি'র মধ্যবর্তী আট বছরে ওরগানের বুক দিয়ে বয়ে গেছে অনেক কিউসেক জল, যার প্রতিটি তরঙ্গ প্রত্যক্ষ করেছে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধকে। শোইঙ্কার জীবনে এই গৃহযুদ্ধের ভূমিকা অপরিসীম। দেশেবিদেশে গুজব রটে যায় যে ওলে আর জীবিত নেই। কিন্তু উনি তখন কাছুনার জেলে। প্রায় সাতাশ মাস পর ছাড়া পাবার কিছু দিনের মধ্যে দেশ থেকে নির্বাসিত হলেন। স্বভাবতই জীবনের দ্বিতীয় উপন্যাস লিখতে বসার সময় শোইঙ্কার কবিসত্তা এবং সৌন্দর্য-বোধের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশেছিল ঋজু সমাজ-মুখী অন্তরদৃষ্টি। সম্ভবত এই কারণেই "সীজন অব অ্যানোমি" হাতে নিয়ে আমরা এক দ্বিমুখী প্রত্যাশার তাড়না অনুভব করি। প্রথমত, 'ইনটারপ্রিটারস'-এর স্রষ্টার শৈলী এ উপন্যাসে কতদূর এগিয়ে গেছে? দ্বিতীয়ত, নাইজেরিয়ার 'গৃহযুদ্ধ'-নামক মারণযজ্ঞ

দেশের সবচেয়ে সংবেদনশীল শিল্পীর চেতনাস্তরকে কোন্ প্রতিক্রিয়ায় বিদ্ধ করেছে? বলতে কোনো দ্বিধা নেই "ইনটারপ্রিটারস"-এর মুখ্যতা 'সীজন অব অ্যানোমি'তে এসে ধাক্কা খায় এবং বেশ ভালোভাবেই। খুব অল্প কথায় উপন্যাসটির বিষয়বস্তু নিয়ে বলতে হলে বলা যায় যে, গৃহযুদ্ধ, কারাবাস এবং দীর্ঘদিনের নির্বাসন থেকে জন্ম-নেওয়া হতাশা, ক্রোধ এবং গ্লানির মিশ্রণজাত উপলব্ধিই বোধ হয় "সীজন অব অ্যানোমি'র জন্মদাতা। জেমস বুথ বলছেন : Season of Anomy embodies the later Soyinka's most explicit position with regard to politics and the individual's—more particularly the artist's relation to public affairs। মজার ব্যাপার হল, এই জেমস বুথই 'ইনটারপ্রিটারস'-এর মধ্যে 'pessimistic retreat into the private self' খুজে পেয়েছিলেন। সেমবেনে ওউসমানের বিখ্যাত উপন্যাস 'Les Bouts de Bois Dois Dieu'-এর সঙ্গে "ইনটারপ্রিটারস"-এর আঙ্গিক ও বিন্যাসের সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলেন জেরালড মুর। আর জেমস বুথ "সীজন অব অ্যানোমি"র রাজনৈতিক চরিত্রে দেখতে পেয়েছেন ওউসমানের একই উপন্যাসের ছায়া।

শোইঙ্কার সাহিত্য এবং ইয়োরুবা পুরাণ

শোইঙ্কার সাহিত্যচর্চার সঙ্গে পশ্চিম আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী ইয়োরুবা সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ওলের নাটক, উপন্যাস, কবিতা, এমনকি প্রবন্ধের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে ইয়োরুবা পুরাণের নানা দেবদেবী, ধর্মীয় লোকাচার এবং আধ্যাত্মিক বিশ্বাস। স্বভাবতই ওঁর সাহিত্যের আলোচনায় পুরাণপ্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে জায়গা করে নেয়। আমরা গ্রীক পুরাণের সঙ্গে কমবেশি পরিচিত হলেও পশ্চিম আফ্রিকার ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় এবং পুরাণভিত্তিক সংস্কৃতি 'ইয়োরুবা' সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ। এই কারণেই ওলের রচনায় ইয়োরুবা দেবতা ওগান বা ওবাতালার ব্যবহার এবং তার প্রতীকী তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে পারি না। বস্তুত 'ইয়োরুবা'-কে ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্মের মতো কোনো ধর্মীয় মতাদর্শ বললে কিছুটা ভুল করা হবে—এই সংস্কৃতি আফ্রিকার প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সমাজপ্রণালী থেকে উদ্ভূত এক জীবনদর্শন। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কৃতির মতোই 'ইয়োরুবা'রও রয়েছে প্রায় পাঁচশ দেবদেবীবিশিষ্ট এক বর্ণাঢ্য পুরাণ। ঔপনিবেশিক যুগ শুরু হবার পর বহু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ ইসলাম বা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেও ইয়োরুবা বিশ্বাস তাতে বিশেষ ধাক্কা খায় নি। ওলে শোইঙ্কার জন্মও খ্রীষ্টান পরিবারে। তা সত্ত্বেও ওঁর কাছে ইয়োরুবা সংস্কৃতি এবং পুরাণই অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস। শোইঙ্কার সাহিত্যচর্চায় ইয়োরুবা পুরাণের বহু দেবদেবী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম প্রতীকী আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে—কিন্তু ওগানের মতো আর কেউই বোধহয় ওঁর অন্তরদৃষ্টি এবং শিল্পবোধকে উজ্জীবিত করতে পারে নি। ওগান ইয়োরুবা পুরাণের এক উল্লেখ-যোগ্য দেবতা। কথিত আছে, এই শক্তিমান দেবতা ওগানের জন্যই অন্যান্য ইয়োরুবা দেবদেবীর মর্ত্যে আগমন সম্ভব হয়েছিল। ওগান একাধারে সৃষ্টি এবং ধ্বংসের দেবতা। শোইঙ্কার সাহিত্যচর্চায় ওগান এক অপরিহার্য অঙ্গ। 'আ ডানস ইন দ্য ফরেস্ট' থেকে শুরু করে 'কোংলিস হারভেস্ট', 'ইনটারপ্রিটারস', এমনকি দীর্ঘ-কবিতা 'ইদানরে'—সর্বত্রই আমরা ওগানকে পাই এক অসাধারণ ব্যঞ্জনায়। 'ইয়োরুবা' সংস্কৃতির প্রতি শোইঙ্কার এই অনুরাগ বহু সমালোচকের কাছেই দুর্বোধ্য ঠেকেছে। আধুনিক আফ্রিকার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে এবং বর্তমান বিশ্বের রকমারি জটিল মূল্যবোধ এবং ক্ষয়িষ্ণু মানবিক অস্তিত্বের ব্যবচ্ছেদে ওলে শোইঙ্কা কেন বারবার পৌরাণিক পটভূমির দিকে হাত বাড়ান? 'মিথ ইন আফ্রিকা'

গ্রন্থের লেখক ইসিদোরে ওকপেহু লিখছেন : Soyinka's creative alchemy can be seen in the ways in which various characters in his works, gripped in struggle with an everpresent, insistent reality, are in large measure supported by the qualities of mythic figures for whom they are really present-day manifestation।

ওলের প্রিয় দেবতা ওগানের চরিত্র এবং প্রকৃতির উপর লেখা একটি ইয়োরুবা লোকগাথার ইংরেজি তর্জমার উদ্ধৃতি দিয়েই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি।

Where does one meet him ?
One meets him in the place of battle
One meets him in the place of wrangling
One meets him in the place where
torrents of blood
Fills with longing as a cup of water
does the thirsty.

ইচ্ছা থাকলেও এই নিবন্ধে ওলে শোইঙ্কার সমাজ-চেতনা বা রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা গেল না। এমন একটি মহাদেশ থেকে শোইঙ্কা উঠে এসেছেন বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে পৌঁছেও যেখানে প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতা প্রায়শই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এক গুহাযুগীয় উন্মাদনা নিয়ে। নিজের কমিটমেনট সম্পর্কে বলতে গিয়ে ওলে বলেন : Before one is a writer, I suppose one is a person। সন্দেহ নেই, চারপাশের 'এত ধ্বংস, এত সন্ত্রাস, এত আর্তি' ওলের শিল্পীসত্তার ভিতরে লুকিয়ে-থাকা মানুষটিকে বারবার বিচলিত করে। শোইঙ্কা বিশ্বাস করেন স্বাধীনতা ছাড়া ওঁর আর কিছু হারানোর নেই।

ওলে শোইঙ্কা আফ্রিকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ১৯৭৫ সালে বারনুথ লিনডফরস বলেছিলেন যে, ওই মহাদেশের সাহিত্যালোচনায় ওলের জন্য ব্যয় করতে হবে একটি সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদ। আজ পৃথিবীর দেশে-দেশে আলোচিত হচ্ছেন এই কৃষ্ণকায় মানুষটি। অন্য কোনো লেখকের সঙ্গে তুলনা করলে ওঁর মতো বড়ো মাপের প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হবে—হয়তো অন্যায়ও।

শোইঙ্কা এই মুহূর্তে কোথায় আছেন জানি না। যেখানেই থাকুন না কেন, খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছনো এই মানুষটি সতীর্থ, শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু এবং অগণিত ভক্তের উত্তাল অভিনন্দনের মাঝে দাঁড়িয়ে হয়তো নিজেরই কবিতার পঙ্‌ক্তি আওড়াচ্ছেন মনে মনে :

I never feel I have arrived
though I come
to journey's end

আ ন্ত র্জা তি ক

অর্থনীতি সংস্কৃতি সাম্রাজ্যবাদ

ইউনেসকো সংকটের ভূমিকা

সৌরীন ভট্টাচার্য

গত কয়েক বছর ধরে ইউনেসকো বিষয়ে খবরাখবর প্রায়ই থাকছে সংবাদপত্রে। এই আন্তর্জাতিক সংস্থা বেশ কিছুদিন হল এক ধরনের সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ইউনেসকো থেকে বেরিয়ে গেল, সেটা এই সংকটের একটা চরম প্রকাশ তাতে সন্দেহ নেই। এই সংস্থার বর্তমান কর্ণধার ডিরেকটর-জেনারেল আমাদু মাহ্‌তার এম'বাও তাঁর বর্তমান কার্যকালের মেয়াদ শেষ হলে আর তৃতীয়বার ওই পদে প্রার্থী হবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। কার্যকারণসূত্রে যোগাযোগ কতটা আছে বলা শক্ত, তবে ওই ঘোষণার পর থেকেই একটু-আধটু জল্পনা-কল্পনা চলছে যে, আমেরিকার আবার ফিরে আসার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে। অবশ্য এখনো পরিষ্কার নয়, হবার কথাও না। এম'বাওয়ের কার্যকাল আরো প্রায় এক বছর আছে। সাত বছরের জন্য তাঁর দ্বিতীয় দফার মেয়াদ শুরু হয়েছিল ১৯৮০-র ১৫ নভেমবর থেকে। ওই বছরের ২৩ সেপটেমবর থেকে ২৮ অকটোবর পর্যন্ত বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইউনেসকোর সাধারণ সম্মেলনের একুশতম অধিবেশন। তখন এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য-সংখ্যা ১৫৫। ওই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ১৪৮টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ। ডিরেকটার-জেনারেল পদে এম'বাওয়ের নির্বাচন ছিল সর্বসম্মত। ১৯৮৭-র ১৫ নভেমবরে ইউনেসকোতে তাঁর নেতৃত্বের চোদ্দ বছর পূর্ণ হবে। আরো সাত বছরের জন্য একই পদে একই ব্যক্তির বহাল না থাকাই ভালো। এটা খুব সাধারণ কথা। এবং ইউনেসকো বিতর্কের বিভিন্ন পর্বে সোভিয়েত রাশিয়া এবং তৃতীয় দুনিয়ার অনেক দেশ সেনেগালের এই সহকর্মীর প্রতি তাঁদের যে সমর্থন জানিয়েছিলেন তাতেও ঈষৎ সুর-বদল হয়েছে বলে মনে হয়। অন্তত এম'বাওয়ের বিদায়পর্বে তাঁর সহযোদ্ধারা বেঁকে বসেন নি। হয়তো বা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেছেন এঁরা। কারণ এম'বাওয়ের ছুতো করে পশ্চিমী দেশগুলো যে অসহযোগ এবং সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিয়ে চলেছে সেই ছুতোটা অন্তত আর থাকবে না।

এ ছাড়া এম'বাওয়ের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্তরের অনেক সমালোচনাও আছে। তার কিছু-কিছুতে এম'বাওয়ের সমর্থকরাও হয়তো অংশীদার। এম'বাও নাকি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূরণের জন্য ইউনেসকো প্রতিষ্ঠানকেও

৫-৭ ডিসেমবর ১৯৮৬তে ইনডিয়ান স্কুল অব সোশ্যাল সায়েনসেস আয়োজিত আলোচনাচক্রে পঠিত প্রবন্ধের পুনর্লিখন।

ব্যবহার করতে নাকি তিনি কার্পণ্য করেন নি। তিনি নাকি রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারি-জেনারেল পদের জন্য নিজের ব্যাপারে তদ্বিরও করেছেন। এসব কেচ্ছা সম্বন্ধে সত্যিমিথ্যে নির্ধারণ করা বাইরে থেকে প্রায় অসম্ভব। আর সেটা আমাদের আপাতত উদ্দেশ্যও নয়। এম'বাওয়ের ব্যক্তিত্ব আদৌ এই রচনার আলোচ্য বিষয় না, এমন-কি প্রাসঙ্গিক বিষয়ও নয়। এম'বাও পর্বের ইউনেসকোর ক্রিয়াকলাপ এবং প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যৎ নিয়ে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব, এক কথায় যে-সংকট দেখা দিয়েছে তার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করাই আমাদের লক্ষ্য। বস্তুত, এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সমস্ত আক্রমণের লক্ষ্য ব্যক্তি হিসেবে এম'বাওয়ের দিকে নিবদ্ধ হওয়ায় অন্য কিছু-কিছু জরুরি প্রসঙ্গের দিকে নজর হয়তো তেমনভাবে যাচ্ছে না। ইউনেসকো সংকট শুধু একটা প্রতিষ্ঠানের সংকট নয়; এই ধরনের আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে এরকম সংকট দেখা দিতেই পারে। কিন্তু বর্তমান সংকটের গভীরে এমন কিছু আছে যা একটা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক গুরুতর। এই সংকটের বিশ্লেষণ সেই কারণে আমাদের কাছে জরুরি। অর্থনীতি সংস্কৃতি এবং সাম্রাজ্যবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কিছু ধারণা সেই বিশ্লেষণে আমাদের খুব কাজে লাগবে।

আমি ইংরেজি কালচার কথাটিকে সরাসরি বাঙলায় ব্যবহার করছি। ঠিকমতো বাঙলা প্রতিশব্দ পাবার অসুবিধে আছে। তা ছাড়াও এর লাগোয়া বাঙলা শব্দ যেগুলো আছে তার প্রত্যেকটার নিজস্ব অনুষঙ্গ গড়ে উঠেছে। ফলে কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করার জন্য কালচার-এর পুরোপুরি প্রতিশব্দ পাওয়া হয়তো সহজ হবে না। কালচার—এই একটা কথা দিয়ে বিভিন্ন প্রসঙ্গে এত বিভিন্ন রকমের ধারণা বোঝানো হয়ে থাকে যে শব্দটির ভেতরেই এক ধরনের জটিলতা তৈরি হয়ে গেছে। নাচগান সিনেমা থিয়েটার শিল্প সাহিত্য অর্থে আমরা যে সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহার করি, কালচার তারও প্রতিশব্দ বটে। আবার নৃতাত্ত্বিকের ধারণায় একটা জনগোষ্ঠীর আচার-আচরণ, জীবনযাপনের ধরনধারন থেকে আরম্ভ করে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, তৈজস, আসবাব ইত্যাদি—এ সবই কালচার শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। কালচার-এর মতো জটিল ধারণার সংজ্ঞানির্দেশের চেষ্টা খানিকটা অর্থহীন। টি. এস. এলিয়ট তাঁর সুপরিচিত বইয়ে সে-চেষ্টা একবার করেছিলেন। খুব একটা কূলকিনারা তিনি পান নি। বিশ্লেষণী কোনো ধারণা হিসেবে তাঁর রচনায় যে-কালচারের হদিশ পাওয়া যায় তাতে আমাদের কাজ চলবে না। গোটা দেশের কালচার, জনগোষ্ঠীর কোনো অংশের আংশিক কালচার এবং ব্যক্তিগত কালচার—এই রকমের ত্রিস্তর শ্রেণীবিভাগের পল্লবগ্রাহিতায় তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। বরঞ্চ ইনডাস্ট্রি, ডিমক্রেসি, ক্লাস, আর্ট—এই চারটি শব্দের অর্থবিবর্তনের অনুষঙ্গে কালচার শব্দটিকে রেমনড উইলিয়ামস যেভাবে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন তাতে আমাদের প্রয়োজন হয়তো কিছুটা মিটতে পারে। তবে সে পথেও আমরা যাচ্ছি না। কালচার বিশ্লেষণের রকমারি দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবৃত্ত রচনা করা এখানে নিশ্চয়ই আমার উদ্দেশ্য নয়। ধারণাটির কোনো ছিমছাম সংজ্ঞাও আমি বাতলাতে চাইছি না। আমি যেভাবে কথাটিকে ব্যবহার করব তার একটা আন্দাজ শুধু দিতে চাই।

আমি ধারণাটিকে একটা সামাজিক ক্যাটিগরি হিসেবে ব্যবহার করব। রেমনড উইলিয়ামসও অবশ্য তা-ই করেছিলেন। আমার এই ব্যবহারে ব্যক্তিগত কালচার-এর ভূমিকা নগণ্য। রুচি, আভিজাত্য ইত্যাদি যেসব প্রসঙ্গে আমরা ব্যক্তিগত কালচারের কথা বলে থাকি সেটা আমার মতে খুব জরুরি, প্রয়োগ হিসেবেও তা অত্যন্ত সংগত। তবে আপাতত যে-উদ্দেশ্যে আমি কালচারের কথা ভাবছি তার জন্য সেটা খুব প্রাসঙ্গিক নয়। আমি ভাবছি সমষ্টির কথা, সামাজিক জনগোষ্ঠীর কথা। এই স্তরে কালচার বলতে যা বোঝায় তার পরিধি যেমন ব্যাপক, স্বরূপ তেমনি জটিল। সামগ্রিক জীবনচর্যা, যার মধ্যে বস্তুগত স্তর থেকে চৈতন্য পর্যন্ত একসঙ্গে ধরা পড়তে পারে, তাই কালচার। ধর্মাধর্ম, ন্যায়নীতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সবই কালচার-এর এই ব্যাপক ধারণার অন্তর্গত। রেমনড উইলিয়ামস-নির্দেশিত চতুর্থ মানেটা এই ধারণার খুব কাছাকাছি। 'A whole way of life, material, intellectual and spiritual'—এই হল কালচারের একটা অভিধা। তবে আমি যেহেতু কালচারের তত্ত্ব নিয়ে এখানে ভাবছি না, তাই এই অভিধার খুঁটিনাটি বিচারে আপাতত কোনো দরকার নেই।

কালচারকে যখন সামাজিক ক্যাটিগরি হিসেবে দেখতে চাইছি, তখন আমার উদ্দেশ্য থাকছে অর্থনীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক বুঝে নেওয়া। অর্থাৎ, কালচার বিশ্লেষণ আপাতত

আমার লক্ষ্য নয়। কালচারের কথা আদৌ ভাবছি অর্থনীতির কথা ভাবতে গিয়ে। কালচারই যদি আমার আলোচনার লক্ষ্য হত তাহলে যে-অর্থে পূর্ণাঙ্গ কালচার-তত্ত্বের দরকার হত, আপাতত তা হবে না বটে, তবে অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ভাবতে গিয়েও কালচারের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করে নিতে হবে। কালচারের কথা ভাবতে গেলে অনেকগুলো মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। সামাজিক চৈতন্য আর তার উদ্ভব, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, সামাজিক চৈতন্যের বাহক হিসেবে ব্যক্তির ভূমিকা, কালচারের স্বয়ংনির্ভরতা, অর্থাৎ অটোনমি—এর প্রত্যেক প্রশ্নই খুব জরুরি। এবং মুশকিল এই যে, এসব প্রশ্নের কোনোটারই তর্কাতীত কোনো উত্তর নেই, থাকার কথাও নয়। এবং এর যে-কোনো প্রশ্নের উত্তর আসলে একটা বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের তত্ত্বকাঠামোর সঙ্গে জড়িত। এক-একটা তত্ত্বপরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে আনুষঙ্গিক নানা প্রশ্নের বুনোট গড়ে ওঠে কোনো নির্দিষ্ট প্রসঙ্গের সমস্যাপট, ইংরেজিতে যাকে বলে প্রব্লেম্যাটিক। সমস্যাপটচ্যুত কোনো প্রসঙ্গের আলোচনা তাই মূলত তাৎপর্যহীন। কালচারের প্রসঙ্গে উপরে যে সমস্যাগুলোর উল্লেখ করেছি, তাদের বেলাতেও তা-ই। সেইজন্যে সমস্যাপটের কথাটা গোড়াতেই পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো।

কালচারের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে কাজ করে? প্রথমত, এই প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজছি অর্থনীতির ওপর প্রভাব বুঝতে গিয়ে। কালচারের ওপরে কী অভিঘাত হচ্ছে সেটা জানবার জন্যও আমরা যেখান থেকে শুরু করছি সেখান থেকে যাত্রা শুরু করা যেতে পারত। তবে সেটা এখন আমাদের লক্ষ্য নয়। দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদের ক্রিয়াকর্ম আমরা তিন স্তরে ভাগ করে দেখতে চাইছি—প্রভাব, প্রাধান্যবিস্তার এবং শেষ আক্রমণ। 'শেষ' কথাটাকে আক্ষরিক অর্থে নিয়ে কোনো লাভ নেই। চূড়ান্ত পর্যায় গোছের একটা ধারণা ভাবলে হয়তো সুবিধে হবে। অন্তত, প্রথম দুই পর্যায়ের থেকে আলাদা অন্য স্তরের একটা কিছু—এরকম ভাবতে হবে। আশা করছি এতে করে আমাদের চেনা অভিজ্ঞতাকে খানিকটা বুঝতে পারা যাবে। তৃতীয়ত, চৈতন্য ইত্যাদি যে-তত্ত্বপ্রসঙ্গগুলোর উল্লেখ করেছি তাদের ভূমিকা ঠিক এই জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অর্থনীতির ওপর প্রভাব জানতে গিয়ে কালচারের কথা পাড়ছি যখন, তখন প্রশ্ন উঠবেই কালচার আর অর্থনীতি কিভাবে পরস্পর-সম্পৃক্ত।

যে-কোনো সমাজের অর্থনীতি একটা পরিমণ্ডলের মধ্যে কাজ করে। এক ধরনের অর্থনীতির চর্চায় একটা সংস্কার গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে ওই পরিমণ্ডলের প্রসঙ্গটা প্রায়শই পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। তবে একথা প্রায় সবাই মানবেন যে, ওয়ালরাস-কথিত 'শুদ্ধ' অর্থনীতি এক হিসেবে অলীক কল্পনা—বিশ্লেষণী পদ্ধতি হিসেবে তার একটা ভূমিকা নিশ্চয়ই ছিল। বর্ণনাত্মক অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি থেকে খুব বেশি কিছু আশা করলে অন্যায় হবে। ওয়ালরাসীয় শুদ্ধতার সংস্কার ছেড়ে দিতে পারলেই আমরা পরিমণ্ডল বিষয়ে সজাগ হতে পারব। পরিমণ্ডল বলতে আপাতত দু-রকম পরিমণ্ডলের কথা ভাবছি আমরা—প্রাকৃতিক এবং সামাজিক। এই দু-রকম পরিমণ্ডলের সঙ্গেই অর্থনীতির **বিনিময়**-এর সম্পর্ক রয়েছে। আজকের দিনের পরিবেশসচেতনতার দৌলতে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা অর্থনীতির চৌহদ্দির মধ্যে বেশ খানিকটা হতে পারছে। সেই কারণে বর্তমানে আমার আলোচনার বিষয় অন্য পরিমণ্ডল। যাকে কালচার বলে এই আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হচ্ছে (অবশ্যই সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি) সে জিনিস ওই সামাজিক পরিমণ্ডলের অঙ্গ।

অর্থনীতি, পরিমণ্ডল ইত্যাদি বলতে গিয়ে যে "বিনিময়" শব্দটা ব্যবহার করলাম সেটা ইচ্ছাকৃত। যখন বলি অর্থনীতির ওপর পরিমণ্ডলের প্রভাব, তখন শুধুমাত্র একটা দিককার কথাই ভাবছি। আবার পরিবেশ আন্দোলনের প্রসঙ্গে যখন ভাবি পরিমণ্ডলের ওপর অর্থনীতির প্রভাব, তখন শুধু অন্য দিকটার কথা মাথায় থাকে। "বিনিময়" বলতে দুটো দিকের কথাই বলতে চাইছি। এটা কেবল কথার কথা নয়। কারণ, বিশেষ করে কালচার প্রসঙ্গে অটোনমির বা স্বয়ংনির্ভরতার একটা তর্ক আছে, সেটা এই জায়গায় এসে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়তে পারে। ভিত্তি/উপবিতল বা বেস/সুপারস্ট্রাকচার ইত্যাদি রূপকে যাঁরা একটু সরাসরি প্রয়োগের কথা ভাবেন, তাঁরা অনেক সময়ে যান্ত্রিকতার একটা আবর্তে পড়ে যান। এটা ঠিক যে, মার্কস-এঙ্গেলসের প্রথম দিককার কিছু-কিছু রচনাবলির অনুগত পাঠ থেকে এই ধরনের আবর্ত তৈরি হতে পারে। কিন্তু মার্কসের মৃত্যুর পরে এঙ্গেলসকে যে আবার কলম ধরতে হয়েছিল সেকথা মনে না রেখেও এই যান্ত্রিকতাকে

এড়ানো যায়। ওঁদের মূল তত্ত্ব-উদ্দেশ্য এবং যুক্তির ধারা মাথায় রাখাই এর জন্য যথেষ্ট। কাজেই স্বয়ংনির্ভরতার বিতর্ক খুব জরুরি, কিন্তু এখন থাক।

তবে দুটো কথা এখানে পরিষ্কার বলে নেওয়া ভালো। প্রথম, ভিত্তি/উপরিতলের যে-ছক আমাদের সবার খুব চেনা, সেই ছকে এখানে চিন্তা করা হচ্ছে না। দ্বিতীয়, সমাজ-অর্থনীতির বস্তুভিত্তিই যে একমাত্র একতরফাভাবে সমাজ-দৃষ্টি বা সমাজবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাও এই আলোচনার অন্যতম প্রত্যয় নয়। সত্যিই যদি তা হত তাহলে যে-কোনো একনায়কের পক্ষে কাজটা কিন্তু খুব সোজা হত; কারণ, বস্তুভিত্তির চাবিকাঠি ঘুরিয়েই তাহলে সমাজবোধ নিয়ন্ত্রণে রাখা যেত। শিল্পসাহিত্য সংস্কৃতি সংবাদ এবং আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে একনায়ক তাহলে নির্বিকার থাকতে পারতেন। সমাজ বিষয়ে কোনো অন্যমতের টুঁটি চেপে ধরার দিক থেকে কাজটা অনেক সহজসাধ্য হত। কিন্তু তা তো হয় না। হয় না বলেই ইউনেসকোতে সংকট ঘনিয়ে ওঠে, নামিডিয়া (NAMEDIA)-তে বিভ্রম দেখা দেয়।

এই আলোচনা তাই যে-প্রত্যয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে তা হল ঐ বিনিময়ের ধারণা। বস্তুত, অর্থনীতি এবং তার সমাজ-পরিমণ্ডল, এই দুটো ধারণা নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই সীমারেখা-বিভাজনের একটা সমস্যা বড়ো হয়ে দেখা দেবে। ওরকমের কোনো স্পষ্ট সীমারেখার কথা কল্পনাও করা হচ্ছে না আপাতত। অর্থাৎ, এরকম নয় যে, এই একটা দূর পর্যন্ত অর্থনীতির সীমা, আর তার পরের অংশটা, ধরা যাক, কালচারের অন্তর্গত। বরঞ্চ এরা আগাগোড়াই মিলেমিশে আছে, আর সেজন্যেই বিনিময়ের চিন্তা মাথায় নিয়ে কথা বলতে চাইছি।

মিলেমিশে থাকলেও মিশ্রণের ঘনত্বে তফাত হতে পারে। আর এই তফাতের ওপরে নির্ভর করে অর্থনীতি আর কালচারের পারস্পরিক প্রান্তসীমা বলে একটা ধারণা আমরা ব্যবহার করতে পারি। কতগুলো ক্ষেত্র থাকতে পারে যেখানে আমরা যাকে অর্থনৈতিক কাজ বলি সেটাই প্রধান। আবার অন্য কতগুলো ক্ষেত্রে কালচারের কথাটাই হয়তো বড়ো। কিন্তু একটু ভাবলেই দেখা যাবে যে, সব সমাজে সব সময়ে এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে অর্থনীতি আর কালচার অনেক বেশি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সেগুলোকে বলছি প্রান্তবর্তী ক্ষেত্র। এগুলোর কথা ভাবলে প্রান্তসীমার ধারণা খানিকটা পরিষ্কার হবে। 'সব সমাজে সব সময়ে' বলে যে একটা কথা এইমাত্র বললাম, তার থেকে আর-একটা কথাও বেরিয়ে আসছে। এই প্রান্তসীমার ধারণা আসলে আপেক্ষিক। কোনো একটা ক্ষেত্র ধরে বলা যাবে না যে এটা প্রান্তবর্তী। বিভিন্ন ক্ষেত্র বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজে প্রান্তবর্তী হয়ে ওঠে। একটা উদাহরণের কথা ভাবছি। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের এখানে ছাপাখানার জগতে একটা বিপ্লব ঘটে চলেছে। একটা স্তরে এটা নিশ্চয়ই প্রযুক্তির প্রশ্ন। এতে করে উৎপাদনের ব্যয় আখেরে কমে আসবে। সেই অর্থে এটা অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলে সকলেই বুঝবেন যে, এই প্রযুক্তির সঙ্গে কীরকম অন্তরঙ্গভাবে মিশে আছে রুচিবোধ ইত্যাদির মতো কালচারের অন্তর্গত প্রশ্নও। রুচিবোধ বলতে খুব স্থূলভাবে সুরুচি কুরুচি বা 'অপসংস্কৃতি' নামের কোনো কিছুর জিগির তুলছি না আমি। যেমন, এই সেদিনও আমি একজন রুচিমান বাঙালিকে আক্ষেপ করতে শুনেছি। আমাদের সাহিত্যের নাতিদূর অতীতের কিছু ক্লাসিক নতুন প্রযুক্তির বলে আমাদের অগ্রগণ্য এক প্রকাশনা সংস্থা থেকে যেভাবে পুনঃপ্রকাশিত হচ্ছে তাতে তিনি তাঁর রুচির সায় পাচ্ছে না। নতুন আদলের এইসব পুনঃপ্রকাশনা যে ছাপার দিক থেকে এলেবেলে তা আদৌ নয়, বরঞ্চ ঠিক উলটো। যথেষ্ট ঝকঝকে তকতকে ছিমছাম, এককথায় খুব স্মার্ট, হয়তো একটু বেশিই। বইগুলির অন্তর্লীন চরিত্রের সঙ্গে, তাদের নিজস্ব মেজাজের সঙ্গে ওই প্রসাধিত রূপসজ্জায় কোথায় যেন একটা ছন্দপতন আছে। আর তাঁর রুচি বোধ হয় সেখানেই ধাক্কা খাচ্ছে। মনে রাখা ভালো, তথাকথিত 'অপসংস্কৃতি' এক অর্থে কম বিপজ্জনক। কারণ ওটা বাইরের ধাক্কা, সামলানোর চেষ্টা করা যায়। অন্যটা চোরাবালির টান, দুর্ঘটনা ঘটে প্রায় অলক্ষ্যে।

প্রান্তসীমা বা প্রান্তবর্তী ক্ষেত্রের ওপর যে জোর দিচ্ছি তার কারণ এই যে, প্রভাব, প্রাধান্যবিস্তার, পরিবর্তন, আক্রমণ—এই প্রান্তসীমার ক্ষেত্রেই প্রধানত হয়ে থাকে। ঠিক যেমন বৈদেশিক আক্রমণের থেকে দেশকে রক্ষা করতে গেলে দেশের সীমান্ত আগলাতে হয়, অর্থনীতির জন্যেও কালচার-সীমান্তকে তেমনি আগলাতে হয়। এখানেও বৈদেশিক আক্রমণের সম্ভাবনা প্রবল। কারণ, অর্থনীতির পরিমণ্ডলের যে-প্রসঙ্গ আগে উল্লেখ করেছি, সে-প্রসঙ্গে বলা

চলে যে, ওই পরিমণ্ডলের মধ্যেই একটা অংশ আছে যেটা বহিরাগত। বর্তমানের সংবাদ আর যোগাযোগ বিস্ফোরণের যুগে সেটা না হওয়াই আশ্চর্য। তাই আমাদের আরো সাবধান হবার দরকার আছে। প্রান্তসীমায় অর্থনীতি, কালচার এবং সংস্কৃতি কিভাবে মিলেমিশে থাকে ও পারস্পরিক প্রভাবের মধ্যে দিয়ে এক বিনিময়ের সম্পর্কে বাঁধা পড়ে, তার একটা উদাহরণ হল সাম্প্রতিক অ্যামনিওসিনটোসিস পরীক্ষা। জনমানসে প্রচলিত ধারণা হল যে, ভ্রূণের শিশু পুত্র কিংবা কন্যা তা নির্ধারণ করার প্রক্রিয়ার নাম অ্যামনিওসিনটোসিস। ব্যাপারটা কিন্তু ওরকম নয়। গর্ভের জল (আমনিওটিক ফ্লুইড) পরীক্ষা করে ভ্রূণের সম্বন্ধে অনেক আগাম তথ্য পাওয়া সম্ভব। শিশুর লিঙ্গনির্ণয়সংক্রান্ত তথ্যও তাদের মধ্যে অন্যতম। এই নতুন চিকিৎসাপ্রযুক্তির একটা সুস্থ প্রয়োগক্ষেত্র হল ভ্রূণাবস্থাতে জন্মরোগ ইত্যাদির আন্দাজ করা এবং সে সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশের বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের জন্য এই পরীক্ষাপদ্ধতির প্রধান প্রয়োগ হচ্ছে স্ত্রীসন্তানের জন্মনিবারণে। দেশের জনসংখ্যা, আগামী দিনের জনসংখ্যায় স্ত্রী-পুরুষের আনুপাতিক অসংগতি—এসব বিপদের কথা সহজেই অনুমেয়। আর গোটা ব্যাপারটার মধ্যে যে অনৈতিকতা রয়েছে তার কথা না হয় নাই তুললাম। নারী-আন্দোলনের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরও কিছু আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে যে, সম্প্রতি স্টেটসম্যান পত্রিকায় এক প্রতিবেদনে ১৯৮১-র জনগণনার ভিত্তিতে ভারতে নারী-পুরুষের অনুপাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে চলেছে, এই মর্মে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। আমি ওই প্রবন্ধে ব্যবহৃত পরিসংখ্যানের যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না, তুলেও কোনো লাভ নেই। তবে ওই পরিসংখ্যান উল্লেখ করে ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থার উন্নতি বিষয়ে যে-রঙিন ছবি আঁকবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ উঠতেই পারে। সমাজে নারীর অবস্থা বা অবস্থানের মতো সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গে পরিসংখ্যানের ওপর এই জোর আসলে এক ধরনের এক এমপিরিসিস্ট পিছুটান। এমপিরিকাল তথ্যের মধ্যেই সামাজিক সত্যের সবটুকু নিহিত থাকে না—এই সরল কথাটার থেকে সরে গেলে পরিসংখ্যানগত কিংবদন্তী গড়ে, ওঠে এবং তা ক্রমে আমাদের সমাজদৃষ্টিকে প্রভাবিত করে।

প্রান্তবর্তিতার আরো দু-একটা পরিচিত উদাহরণ উল্লেখ করছি। অনেকেই লক্ষ করে থাকবেন যে, সম্প্রতি মেয়েদের পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে একটা বেশ বড়ো রকমের শোরগোল পড়ে গেছে। এর একটা দিক আছে ছাপার জগতের ওই নতুন প্রযুক্তি। কোনো প্রতিষ্ঠিত প্রকাশনা সংস্থাকে আজ আর নতুন কোনো একটা উদ্যম নেবার জন্য খরচের ব্যাপারে বিশেষ কিছু ভাবতে হয় না। কিন্তু আমি মনে করি না যে, এটাই সব বা একমাত্র কথা। বিভিন্ন মহিলা-সংগঠনের অস্তিত্ব, তাঁদের প্রচারকার্য, এবং দেশবিদেশের নারী-আন্দোলনের ফলে, আর কিছু না হোক, মেয়েদের দিকে অনেকের নজর পড়েছে। 'নারী-সচেতনতা'র বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে পুরোপুরি ব্যবহার করা নিশ্চয়ই এইসব প্রকাশনার অন্যতম লক্ষ্য। তাতেও তত ক্ষতি নেই। কোনো পণ্যের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা যদি বেড়েই থাকে তাহলে তার উৎপাদনও বাড়তেই পারে। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু এসবের মধ্যে আশঙ্কার অন্য কারণ আছে।

নারী-আন্দোলনের দিক থেকে মেয়েদের সমস্যায় নজর দেওয়া বলতে যা বোঝায়, আর এইসব গণমাধ্যমে মেয়েদের জগৎকে যেভাবে তুলে ধরা হচ্ছে, তা কি এক জাতের? এই সম্পর্কটাকে একটু খুঁটিয়ে দেখা দরকার। ওই যে কালচার-পরিমণ্ডলের কথা বলছিলাম সেখানকার কোনো একটা কোনাখাঁচড়ে খুঁজলে দেখা যাবে যে, "মেয়েদের জগৎ" বলে একটা স্টিরিওটাইপ গড়ে তোলা আছে। তাতে খানিকটা বাস্তব, কিছুটা কল্পনা আর বেশ খানিকটা রূপকথার মিশেল দিয়ে একটা জিনিস বানানো হয়েছে যার প্রভাব শিকড়ে-শিকড়ে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। "এই মেয়েদের জগৎ"টাকে জগতের সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া যদি নারী-আন্দোলনের লক্ষ্য হয়, তাহলে এই মেয়েদের পত্রিকার "মেয়েদের জগতে"র লক্ষ্য হচ্ছে সেই জগতের দেয়ালগুলোকে আরো মজবুত করে তোলা। এই স্টিরিওটাইপকে টিঁকিয়ে রাখবার একটা কৌশল হল রঙেরসে গড়া একটা অলীক জগতের মোহ তৈরি করা এবং অনবরত কানের কাছে মন্ত্রপড়া যে এই জগৎ চাওয়ামাত্র আপনারও হতে পারে। অর্থাৎ, চাইবার জন্য উশকে দেওয়া। ২০৮৬ সালের গবেষক এইসব পত্রিকা থেকে জানবেন যে, ১৯৮৬-র বাঙালি মেয়েরা নিশ্চয়ই এইসব

মুখরোচক খাবার দুবেলা বানাতেন—ফিস ম্যাণ্ডারিন (sic), স'তে চিকেন উইথ গ্রীন পেপার, উত্তরপ্রদেশের কষা মাংস, অন্ধ্রপ্রদেশের মাছের ঝাল, কিমা, চিংড়ির ঝাল ফ্রেজি, নেপালি চিকেন কারি, মুড়োর স্টু, কাশ্মিরি দমপোক্ত রাং, কমলালেবু-স্ট্রবেরি পাঞ্চ, গ্যাজপাচো স্যুপ, চিকেন ইন লেমন সস, চকোলেট সুফ্লে, অরু শুভ্র, আইল্যান্ড স্টাইল চিকেন, মাছের বেক, রাজমা স্যালাড, গারলিক ব্রেড, চিজ কেক ইত্যাদি। অথবা এই ১৯৮৬-র মেয়েরা বুঝি ইংলনডেশ্বরীর পুত্রের বিবাহ বা ঐ রাজবাড়ির গয়নাগাটির খোঁজখবর পাবার জন্য রাতের ঘুম মাথায় তুলে বসেছিলেন। নইলে ১৯৮৬-র বাঙালি সাংবাদিক শুধু এই "গুরুত্বপূর্ণ" বিশ্বসংবাদ কোনো এক পত্রিকার জন্য একসক্লুসিভ করতে অত খরচখরচা করে বিলেত ছুটবেন কেন?

কিন্তু ব্যাপারটা শুধু এই পর্যন্ত হলেও অত ভাববার কিছু ছিল না। বড়োজোর "অপসংস্কৃতি"-র মতো দাঁড়াত ব্যাপারটা। এইসব মেয়েদের পত্রিকার অনেকের মিশেল আরো সূক্ষ্ম এবং আক্রমণটাও সেই হিসেবে খানিকটা চোরাগোপ্তা এবং অনেক জোরালো। এঁদের ফীচারগুলো যে শুধু খাওয়াদাওয়ার বদলে রান্নাবান্নার, পোশাক-পরিচ্ছদের বদলে ফ্যাশনের, কোন্ ধরনের ক্রুশে বোনা ব্লাউজ পরে আয়নার সামনে দাঁড়ালে কেমন দেখাবে—তাই জানিয়ে দেবার, তা তো নয়। "মেয়েদের জগতে"র ঐ স্টিরিওটাইপকে টিঁকিয়ে রাখতে, প্রয়োজনমতো সংস্কার করে নিতে গিয়ে এঁরা যেটা তৈরি করছেন, একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সেটা হল দেশের মধ্যে আর-একটা দেশ বানানো। এঁদের ওইসব ফীচারের পাশাপাশি যদি একথা তোলা যায় তো কেমন শোনায়? আমাদের দেশে রাঁচি বলে একটা জায়গা আছে। সেখানকার আশপাশের অরণ্যনির্ভর জীবনযাপন করেন এমন মেয়েদের উপর সমীক্ষা গবেষণা করে দেখা গেছে যে, বনের কাঠকুটো সংগ্রহ করে মাথায় বয়ে নিয়ে রাঁচির বাজারে বিক্রি করে আবার ঘরে ফিরে রান্না করা—এ ব্যাপারটায় তাঁদের দুদিনের একটা বৃত্ত তৈরি করে নিতে হয়। অর্থাৎ, গতকাল রাতের রান্না খাবার খেয়ে আজ ভোর রাতে বেরোলে আবার আগামীকাল রাতে বাড়ি এসে রান্না চড়াবে। দেশের মধ্যে যে দেশ, তাদের মধ্যে এতই ফারাক। "মেয়েদের জগতে"র স্টিরিওটাইপ এই ফারাকটাকেই টিঁকিয়ে রাখে। এদিকে দেশের মধ্যে ওই যে দেশ, সমাজ-অর্থনীতির সকলেরই লক্ষ্য ওই দেশ। অর্থনীতির সব পণ্যোৎপাদন ওই দেশের জন্যেই হতে থাকে। রঙিন পত্রিকা থেকে টি. ভি. র বিজ্ঞাপনের সেই মদির কণ্ঠস্বর—সবই ওই দেশের জন্য। ওই দেশের জন্য চাই হরেক রকম সাবান, আরো হরেক রকম শ্যামপু, ইত্যাদি ইত্যাদি আরো অনেক-অনেক কিছু। এই যে ভেতর দিককার বানানো দেশ, সেটার কথা ভেবেই ওইসব মেয়েদের পত্রিকায় আরো নতুন ধরনের স্টিরিওটাইপ তৈরি করতে হয়। "নতুন নারী", "সমাজসচেতন নারী" ইত্যাদি সেই নতুন স্টিরিওটাইপ। এই মেয়েরা জানবেন যে, গত দশ-পনেরো বছরে আমাদের সমাজে এক "নতুন নারী"র জন্ম হয়েছে। তার জন্য ম্যানেজমেনট থেকে মডেলিং পর্যন্ত সব রকম কেরিয়ারের পথ খোলা আছে। এই মেয়েদের জন্য সংবিধানে নারীর অধিকার থেকে আরম্ভ করে আরো অনেক সত্যিকার প্রয়োজনীয় তথ্য জানানো হবে। এবং জানাবেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের তারকা-সদৃশ যাঁরা তাঁরাই। চিত্রাভিনেতা, চিত্রপরিচালক, বিজনেস ইগ্‌জেকিউটিভ, লেখক, গাইয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। বানানো দেশের বানানো কথকেরা তাঁদের কথকতার নিত্য খোরাক পেয়েই যাবেন। আর তবেই না তাঁরা ক্রিয়েটিভ।

দেশের মধ্যে দেশ বানানোর এই যে খেলা, যে-খেলায় অর্থনীতি-সংস্কৃতি হাত ধরাধরি করে চলে, তা কিন্তু অনেক ছোটো বয়স থেকেই শুরু করা হয়। ছোটোদের পত্রিকার কিছু ফীচার বিশ্লেষণ করলে এর নজির মিলবে। আপাতত একটা খুব ছোটো উদাহরণ উল্লেখ করছি। একটি বিখ্যাত ছোটোদের পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে একটা নিয়মিত ফীচার ছাপা হয়। বিভিন্ন তথাকথিত "ভালো" স্কুলের "প্রধানশিক্ষক, প্রধানশিক্ষিকা কী বলেন" আর সঙ্গে সেই স্কুলের ফার্স্ট বয় বা ফার্স্ট গার্ল কিভাবে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়, এবং সে বড়ো হয়ে কী করবে, তার একটা ছোটো প্রতিবেদন। শোনা যায়, বিনয় সরকারের একটা শব্দ ধার করে বলছি, 'ত্যাঁদড়' বার্নার্ড শ একবার এক স্কুলের পুরস্কারবিতরণী সভায় গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, সবচেয়ে খারাপ ছেলেটিকে তিনি একটা পুরস্কার দেবেন। আমাদের পত্রিকার ওই ফীচার পড়লে এসব ত্যাঁদড়ামির তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। ওই প্রতিবেদনের ভালো ছাত্রদের প্রায় সবাই দারুণ ভালো, তারা ক্লাস ফাইভ-সিকস থেকে বরাবর ফার্স্ট হয়ে ক্লাসে ওঠে, তারা আট-দশ ঘণ্টা করে পড়াশোনা করে, তাদের প্রত্যেকের গড়ে তিনজন করে গৃহশিক্ষক আছেন, তাদের প্রত্যেকের উচ্চাশা ডাকতার এনজিনীয়ার বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি হওয়া, আর তারা সবাই প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে একটি নির্দিষ্ট ছোটোদের পত্রিকায় নিয়মিত পাঠক। এইসব ভালো-ভালো ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে কোন্ কোন্ লেখকের নোটবই পড়ে তা পর্যন্ত এই ফীচারগুলো থেকে জানতে পারা যায়। যে ছেলেরা মেয়েরা এসব তালিকার মধ্যে আসে না—তারা অতএব আলাদা জগতের বাসিন্দা। এই যে আড়াই-লক্ষ-মতো ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেয় তার সোয়া-দুই-লক্ষ-মতোই ওই আলাদা জগতের নাগরিক, বড়ো হবার পরেও তাদের নাগরিকত্ব ওই আলাদা দেশের, আর ছোটোবেলা থেকেই তারা এতে যেন অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কিসে ভালো হওয়া যায় ছোটোদের পত্রিকায় ছোটোদের কাছে সেকথা জানানোই তো আমাদের কাজ। এই প্রসঙ্গে আবারও মনে পড়ে, পুরুলিয়া জেলায় বেগুনকোদর বলে একথা গ্রাম আছে। কলকাতা থেকে সমীক্ষা-গবেষকদের একটা দল একবার সেখানে গিয়েছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের জন্য। সেখানকার এক নৈশ শিক্ষাকেন্দ্রের ভেতরে দাঁড়িয়ে সমীক্ষকদের একজনের মনে পড়েছিল কলকাতার লা মার্টিনীয়ার স্কুলের কথা। বেগুনকোদরের ওই শিক্ষাকেন্দ্রে স্কুলবাড়ি বলতে একটা খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর, আসবাব বলতে দেয়ালে ঝোলানো একখানা ছোট ব্ল্যাকবোর্ড আর কয়েকখানা বসবার চাটাই, প্রত্যেকের জন্য একখানা করে কুলোয় না। বয়স্কশিক্ষার্থী বাবা আর শিশুশিক্ষার্থী ছেলে এক চাটাইয়ে ভাগাভাগি করে বসা। সময়টা ছিল জানুয়ারি মাস। একটা ছেঁড়া চাদরে টানাটানি করে শীতনিবারণের চেষ্টা। অঞ্চলের একমাত্র স্কুলফাইন্যাল পাশ যুবক একাই মাস্টারমশাই। স্লেট কয়েকখানা আছে, সংখ্যায় গুনতিতে কম পড়ে। সরকার বা স্বেচ্ছাসঙ্ঘ থেকে পাওয়া বইয়ের অবস্থা তথৈবচ। ওই সমীক্ষকের মনে হয়েছিল লা মার্টিনীয়ার সত্যিই অনেক দূর।

দেশের মধ্যে দেশের এই যে মডেল, এ কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অর্থনীতির মনঃপূত। এতে করে যেসব জিনিসের চাহিদা বাড়বে সেসব জিনিস বানানোতে সবারই আগ্রহ থাকবে। বেশির ভাগের জন্য ভাত-কাপড়ের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার চেয়ে প্রাগ্রসর শিল্প অর্থনীতি গড়ে তোলা অনেক বেশি রোমাঞ্চকর আর লাভজনক। ভারত আজ যে দশম শিল্পোন্নত দেশের মর্যাদা লাভ করেছে, সে তো ওই পথেই, অর্ধেক লোককে দারিদ্র্যসীমার নীচে রেখেই। কিন্তু এই বিপুল জনসংখ্যার দেশের বাকি অর্ধেক কেন, এক-তৃতীয়াংশও কিছু কম লোক নয়। বানানো দেশের বানানো অর্থনীতি বানানো সংস্কৃতি ওই এক-তৃতীয়াংশ লোক নিয়েই দিব্যি চলতে পারে। তা ছাড়া বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা ইত্যাদির সার্টিফিকেট কি আমরা নিয়মিত পাই না?

অর্থনীতি আর কালচারের প্রান্তসীমায় একটু-একটু করে প্রভাব বিস্তার করা, আস্তে-আস্তে প্রাধান্য পাওয়া—এসবের একটা প্রক্রিয়া প্রায় অলক্ষ্যে চলছেই। আসলে প্রভাব, প্রাধান্যবিস্তার এবং শেষ আক্রমণের যে-ত্রিস্তর বিন্যাসের কথা গোড়ায় ভেবেছিলাম সে ব্যাপারটা আরো বিস্তারিত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রক্রিয়াটা উনিশ শতকী 'নবজাগরণ'-এর সময় থেকেই হয়তো কাজ করছে। আমাদের তথাকথিত রেনেসাঁস যত দানা বেঁধেছে সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা-অর্থনীতি সবকিছুর মধ্যে দিয়ে প্রভাব তত প্রাধান্যে রূপ পেয়েছে। সমাজজীবনের একটা বিশেষ ধাঁচ ক্রমশ শ্রেয়, কাম্য, অনুকরণীয় আদর্শ বলে গৃহীত হয়েছে। সেই ধাঁচের বেড়াজালে ঘেরা বৃত্তের পরিধি যতই সংকীর্ণ হোক না কেন, তা ক্রমশ আরো বহু মানুষের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে। আর সে ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি সবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এইভাবেই প্রভাব একদিন প্রাধান্যে উত্তীর্ণ হয়েছে। স্বাধীনতার পরে প্রায় চল্লিশ বছর পার হতে চলল। প্রাধান্যবিস্তার এই সময়ের মধ্যে প্রায় আক্রমণের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজি-মাধ্যম লেখাপড়া থেকে আরম্ভ করে সমাজজীবনের অনেক স্তরেই এই আক্রমণের আঁচ টের পাওয়া যায়।

আক্রমণের প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, আক্রমণ অনেক সময়ে একেবারে সরাসরি আসতে পারে। সংস্কৃতির আর অর্থনীতির প্রান্তসীমায় প্রভাব যেভাবে অলক্ষ্যে কাজ করে সেভাবে সব সময়ে চলে না। অনেক সময়ে দরকার পড়ে প্রত্যক্ষ আঘাতের। সাম্প্রতিক ইউনেসকো সংকট

এই আঘাতের এক নমুনা। ইউনেসকো থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরে দাঁড়ানোর নেপথ্যকাহিনী সংক্ষেপে একটু দেখে নিলে এই ধরনের আঘাতের স্বরূপ খানিকটা চেনা যাবে। ১৯৮৪-তেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুমকি দিয়েছিল ইউনেসকো থেকে সরে দাঁড়াবার। এই সময়ে ইউনেসকোর মোট বাজেটের প্রায় ২৫ শতাংশ ছিল আমেরিকার দায়িত্ব। আমেরিকার অভিযোগ ছিল সংগঠনের অযোগ্যতা, আর্থিক গোলমাল, অপব্যয় ইত্যাদি এবং সর্বোপরি, পশ্চিমী দেশগুলোর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ঝোঁক। বোঝাই যায় যে, এই শেষোক্ত অভিযোগই আসল। কারণ, ইউনেসকোর মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনে যোগ্যতা-অযোগ্যতা, আর্থিক অপব্যয় ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাবার পাত্র আর যেই হোক, আমেরিকা নয়। ওই বিরুদ্ধ রাজনৈতিক ঝোঁকের কথাটাই আসল। পরবর্তী সময়ে যতবার এই অভিযোগের কথা উঠেছে আমেরিকা প্রত্যেকবার সরবে ঘোষণা করেছে যে, ইউনেসকোর মূল দায়িত্ব ছিল বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক, আর এই বর্তমান কর্ণধার এম'বাওয়ের নেতৃত্ব তা বড়ো বেশি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কাজেই অভিযোগের স্বরূপ বুঝতে অসুবিধা হয় না।

কী-রকম ছিল ইউনেস্কোর সাম্প্রতিক কাজের চেহারা? ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেটের দিকে একবার তাকানো যাক :

মোট বাজেটের পরিমাণ ছিল ৩৭ কোটি ৪৪ লক্ষ ১০ হাজার মার্কিন ডলার। এর মধ্যে প্রশাসনিক খরচ ধরা যেতে পারে ১ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪০ হাজার ৩ শো মার্কিন ডলার, অর্থাৎ ৫ শতাংশের মতো। কাজেই বেশির ভাগ খরচ হয়েছে ইউনেসকোর যা করণীয় কাজ সেইসব খাতে। যেমন, বিজ্ঞান, শিক্ষা, পরিবেশ, জাতিবৈর নিবারণ ইত্যাদি। খরচের দিকে দু-একটা প্রধান পরিসংখ্যান উল্লেখ করছি : শিক্ষা—৮ কোটি ৩৭ লক্ষ ৮৩ হাজার মার্কিন ডলার (২১% আ.) বিজ্ঞান—৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৬৮ হাজার ২ শো মা. ড. (১০% আ.), সংবাদ ও যোগাযোগ—২ কোটি ৮৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৭ শো মা. ড. (৮% আ.), পরিবেশ—৩ কোটি ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭ শো মা. ড. (৮% আ), সংস্কৃতি—২ কোটি ৫৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ৩ শো মা. ড. (৭% আ.)। এ পরিসংখ্যানগুলির উৎস ইয়োরোপা ইয়ারবুক ১৯৮৫। ইউনেসকোর করণীয় নয় এমন খাতে বেশির ভাগ টাকা খরচ হয়েছে—এ অভিযোগ অন্তত এই তথ্যের সঙ্গে মিলছে না। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, পরিসংখ্যান থেকে অনেক সময়েই বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। তাই অন্য দিকে তাকাতে হয়। দেখা যাক আলোচ্য সময়ে ইউনেসকো কী কী ধরনের প্রকল্প হাতে নিচ্ছিল যাতে আমেরিকা প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কেই একেবারে বিরূপ হয়ে উঠল। ভেতরে থেকে চাপ দিয়েও কিছু করা গেল না, একেবারে বেরিয়ে আসতে হল। বিশ্বশান্তি বিষয়ে ইউনেস্কোর প্রকল্প নিয়ে ১৯৮৫-র ইয়োরোপা ইয়ারবুক লিখছে : 'ইউনেসকো নানা ধরনের গবেষণা-প্রচেষ্টা সংগঠন করে, যেমন জাতিসমস্যা এবং বিশেষত শিক্ষার ব্যাপারে বৈষম্যনিরোধ এবং মেয়েদের আরো বেশি করে শিক্ষার সুযোগ লাভের পন্থা নির্ধারণ। এ ছাড়াও আরো যেসব গবেষণায় এ প্রতিষ্ঠান উৎসাহ আর সাহায্য দিয়ে থাকে তার মধ্যে আছে সংঘাত ও শান্তি, হিংসা ও নিরস্ত্রীকরণের অন্তরায় এবং শান্তিপ্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক আইন ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা। এ ধারণাটার ওপরে খুব জোর দেওয়া হয় যে, মানবাধিকার, শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ আলাদা করে দেখা চলে না, এবং মানবাধিকারসংরক্ষণ এবং বিশ্বশান্তি পারস্পরিক পূর্বশর্ত।' সম্ভবত এটাই এম'বাওয়ের রাজনীতি, যার জন্য আমেরিকার প্রতিক্রিয়া। অবশ্য প্রতিক্রিয়া হবার কারণ বোধ হয় সত্যিই আছে। এই সময়টাতে ইউনেসকোর সমাজবিজ্ঞান প্রকল্পের অনেক প্রসার হয়। এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ১৯৭৬ থেকেই। এই প্রকল্পের মধ্যে আমরা পাই : 'মানবজাতির কল্যাণমুখী উন্নয়ন সমস্যায় সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োগ কর্মসূচির অন্তর্গত আছে পরিবেশ এবং জনসংখ্যাসংলগ্ন সমস্যা ; এই কর্মসূচির মধ্যে বেশ জোর দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নতুন বিন্যাসের ভূমিকা হিসেবে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভিত্তির দিকে।' [ইয়োরোপা ইয়ারবুক ১৯৮৫] প্রতিক্রিয়ার কারণ এবার একটু-একটু আন্দাজ করা যাচ্ছে বোধ হয়। ওই যে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নতুন বিন্যাস, এটাতে আমেরিকা সমেত পশ্চিমী দেশগুলোর অনেক ওজর আপত্তি আছে। যার জন্যে উত্তর-দক্ষিণ সংলাপে বিশেষ কিছুই অগ্রগতি হতে পারছে না। এদিকে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলো ক্রমশ অনেক ব্যাপারে বেশ জোর গলায় কথা বলছে। কাজেই যেসব আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে তাদের শক্তিবৃদ্ধি হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর ব্যাপারে অন্তর্ঘাতমূলক ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া আর কী করার

আছে? তা ছাড়া শুধু তো অর্থনীতির নববিধানই নয়, সংবাদনিয়ন্ত্রণের নববিধানের কথাও এই ইউনেসকো চৌহদ্দির মধ্যে উঠে পড়ছে। নিউ ওর্ল্ড ইন্‌ফরমেশন অ্যানড কমিউনিকেশন অর্ডার (NWICO) এই নামে গৃহীত কর্মসূচি নিউ ইনটারন্যাশনাল ইকনমিক অর্ডার (NIEO)-এর সঙ্গে মনেপ্রাণে সংশ্লিষ্ট। বস্তুত আমেরিকা এবং তার পশ্চিমী সমর্থকেরা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওই অর্থনীতির নববিধানে বাধা দিয়ে আসছে আজ প্রায় এক দশক ধরে। এই বাধার প্রকাশ আছে আন্কটাড সম্মেলনে, আছে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শীর্ষে, আছে রাষ্ট্রনায়কদের দস্তোক্তিতে। ঠিক তেমনি, হয়তো আরো জোরালোভাবে আমেরিকা বাধা দিয়ে চলেছে এই সংবাদ ও সংযোগের নববিধানকে। বস্তুত, আমেরিকার ইউনেসকো পরিত্যাগের সঙ্গে ইনটারন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর ডিভেলপমেন্ট অব কমিউনিকেশন (IPDC) ও সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির যোগাযোগ খুব সুদূর কল্পনা বোধ হয় নয়। এ যোগাযোগ প্রায় প্রত্যক্ষ। কিন্তু সে প্রসঙ্গ বারান্তরে।

উপসংহারে এসে সূত্রাকারে তিনটি কথা মনে রাখা যাক : ১. সংবাদ সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ আর অবহেলা করা চলে না, বিশেষত বর্তমান দুনিয়ায়। সেই কারণে প্রান্তসীমা সম্বন্ধে আরো সজাগ হবার দরকার আছে। ২. আন্তর্জাতিক অর্থনীতির নতুন বিন্যাস ও সংবাদ ও সংযোগ নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গ দুটিকে একেবারে সংলগ্ন প্রসঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। আলাদা রেখে চিন্তা করতে গেলে দুয়েরই খণ্ডিত চেহারা মাত্র ধরা পড়বে। ৩. এ সবের মধ্যেই ইউনেসকো সংকটের ভূমিকা নিহিত রয়েছে। এই সংকটের বীজ বাজেট বিশ্লেষণে খুঁজে লাভ নেই, খুঁজতে হবে ইউনেসকোর গৃহীত প্রধান কর্মসূচিগুলির মধ্যে। সমাজবিজ্ঞান প্রকল্পের প্রসার, শান্তি, মানবাধিকার, নিরস্ত্রীকরণ, জনশিক্ষার বিস্তার ইত্যাদি প্রত্যেকটা ব্যাপার সাম্রাজ্যবাদের দৃষ্টিতে অস্বস্তিকর। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির ভালোমন্দের সঙ্গে এসব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমেরিকার পক্ষে তাই এ প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে উদাসীন থাকা চলে না। আর শুধু এই প্রতিষ্ঠানই বা কেন? প্রয়োজনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে এলেই বা কী?

ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিতব্য

বিশেষ প্রবন্ধ

দাও ফিরে সে অরণ্য

ব্রজেন্দ্রকুমার দে

বাংলার একান্ত নিজস্ব জনপ্রিয় লোকনাট্য যাত্রার বিগত পঞ্চাশ বছরের সমীক্ষা তুলে ধরেছেন বিখ্যাত পালাকার ব্রজেন্দ্রকুমার দে, তাঁর অভিজ্ঞতার আলোয়। এই সমীক্ষার আবেদন মর্মস্পর্শী।

সমাজচিত্র

আদিবাসী সমাজে পশ্চিমী শিক্ষা —জিমবাবুয়ের আলোকে

দেবব্রত ঘোষ

বিভিন্ন প্রতিবেশী সংস্কৃতি তার অনুসারীদের প্রভাবিত করে পারস্পরিকভাবে। অল্প অথবা বিস্তর। কতটা বিস্তর কিংবা তার বিস্তারের চরিত্র কী, তা নিয়ে তর্কাতর্কি অনেক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে। অবশ্য কিসিং-এর ব্যাখ্যাটি বহুজনগ্রাহ্য। তাঁর মতে একাধিক সুস্পষ্ট সংস্কৃতি যখন কাছাকাছি থাকে একটানা বেশ কিছুদিন ধরে, তখন এক সংস্কৃতি অন্যের বা অন্যদের সাংস্কৃতিক উপাদান কমবেশি আত্মস্থ করে।

এই সূত্র বুঝতে সুবিধে হবে যদি স্বাঙ্গীকরণের পরিস্থিতিটা আরও একটু ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথমত, প্রবল বা ডমিন্যান্ট গোষ্ঠীর চালচলন হাবভাব প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট হওয়া চাই। প্রবল গোষ্ঠীই অন্য সংস্কৃতির মানুষদের বেশি আকৃষ্ট করে।

বিনয় ঘোষ যেমন দেখিয়েছেন, শিল্পবিপ্লব বা পলাশির যুদ্ধের আগে ইঙ্গ-সংস্কৃতি ততটা প্রবল ছিল না এদেশে। প্রবাসী ইংরেজরাই সংস্কৃতি এবং সংখ্যায় প্রবল ভারতীয়দের দ্বারা বেশি আচ্ছন্ন ছিল। ইংল্যানডে শিল্প-বিপ্লবের পর চাকা ঘুরে যায়। ভারতীয় এলিটরাই হয়ে উঠলেন সাহেবিয়ানার ভক্ত। অন্তত ঠাকুরঘরের বাইরে।

দ্বিতীয়ত, প্রবল গোষ্ঠীর সামাজিক-অর্থনৈতিক গুরুত্ব বুঝতে পারা চাই। বুঝতে না পেরে, খোলসে আবদ্ধ থেকে যাওয়ার উদাহরণ এদেশে অনেক উপজাতির মধ্যে পাওয়া যাবে। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে ভারতীয় মুসলিম সমাজে এই বোধ আসতে দেরি হয়েছিল। পশ্চিমায়নেও তারা পিছিয়ে থেকেছে একই কারণে।

তৃতীয়ত, প্রবল গোষ্ঠীর চালচলন, ভাষা, হাবভাব অনুসরণ করলে আখেরে লাভ হবে, অন্তত চৌকিদার, পিয়ন, কেরানি, এমন-কি দারোগা হবারও সম্ভাবনা থাকবে —এমন ধারণা অন্য গোষ্ঠীর মধ্যে থাকা চাই।

চতুর্থত, পুরনো অর্থনীতি ভেঙেছে বা ভাঙছে—এমন হওয়া চাই। ভারতের ক্ষেত্রে তার অর্থনীতি, উৎপাদন, করব্যবস্থা, প্রায় স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম্য সমাজে স্বয়ংনিযুক্ত মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা ইত্যাদি অটুট থাকলে ভারতীয় রাজা-মহারাজারা সাহেবিয়ানার দিকে ঘেঁষতেন না। দেশের লোকজনও সাহেবদের সভ্যতার নামে গদ্গদ হতেন না।

আরও একটি জরুরি শর্ত উল্লেখ্য। অগ্রগামী বা ভ্যান-গার্ড হিসেবে কিছু লোককে অন্তত একাধিক সংস্কৃতির বাহক হতে হবে। যেমন রামমোহন রায়ের ফারসি এবং ইংরাজি জানা। একাধিক সংস্কৃতির ইতিবাচক প্রভাব সেখানে স্পষ্ট। প্রবল পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রাধান্যের মধ্যেও স্বাঙ্গীকরণের দিকটা রামমোহনের চিন্তায় বিধৃত। আবার কালাপাহাড়ের অথবা ডিরোজিয়ানদের কালাপাহাড়ি উৎসাহের কথা বলা যায়। এক্ষেত্রে প্রবল সংস্কৃতির টান একমুখো।

একটা সাম্প্রতিক মোটা দাগের উদাহরণ। দণ্ডকারণ্যে মালকানগিরি মহকুমায় সিয়ামিরডাল-এর আদিবাসী গ্রামে উদ্বাস্তু বাঙালি এবং আদিবাসীদের মিলিতভাবে দুর্গাপুজো হচ্ছে।

একটা জটিল স্তরের উদাহরণ। আমাদের বাঙালি বাবু-কালচারের কথায় আসি। একদা খ্রীষ্টীয় শাসককুলকে আমরা অনুসরণ করেছি। ডিরোজিও-শিষ্যদের মতো উগ্র-ভাবে নয়, ভিকটোরীয় ভাবধারাপুষ্ট ব্রাহ্মদের মারফত চোলাই হয়ে। আজও বাঙালি হিন্দুর সাংস্কৃতিক জীবনে এই ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মধারা-উদ্ভূত ভাবমূর্তিরই প্রাধান্য, অন্তত আধুনিক মনন এবং কর্মের আদর্শ হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে এক উত্তুঙ্গ মূর্তি। ভিকটোরীয় মূল্যবোধ ছাড়িয়ে যেখানে তাঁর উত্তরণ; সেখানে তাঁকে উপলব্ধি এবং গ্রহণ করবার মতো মানস বাঙালি বাবু-সংস্কৃতির আজও হয়নি।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার পশ্চিমী তথা আধুনিক সত্তাটুকু আবার খোলসে ঢাকা। জলের উপর মাখনের মতো একান্তভাবে অসম্পৃক্ত। জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এক ব্যাপার। শিক্ষাসংস্কৃতির স্বাঙ্গীকরণের সুযোগ সেখানে বড়োই কম। ইংরিজি মাধ্যমের শিক্ষালয়ে প্রবল সংস্কৃতির খোরাকে যদি হয় বদহজম, বাঙলা-মাধ্যমে তাহলে লাগাতার অনশন।

সাংস্কৃতিক জগতে বহিরঙ্গের হনুকরণ, বাবু-সংস্কৃতির অক্ষম আধুনিকতা-জাতীয়তাপনা চলতেই থাকবে সম্ভবত আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্রুত ভাঙাগড়া না হলে, কৃষিতে যন্ত্রপাতির বহু-ব্যবহার এবং শিল্পের ব্যাপক প্রসার না হলে। তবে বিজ্ঞান এবং আধুনিক শিক্ষার একটা ইতিবাচক প্রভাব থাকবেই, ধীরান্বিত হলেও, অর্থনৈতিক কাঠামো ততটা পরিবর্তিত না হলেও।

যদি আদিবাসী এবং দূর প্রান্তের সমাজে কোনো আধুনিক শিক্ষালয়ের প্রভাবের কথা ভাবি, তাহলে আলাদা কথা। সে হিসেবে জিমবাবুয়ের সমাজে পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাব নিয়ে গবেষণা আমাদের পক্ষেও মূল্যবান। আফ্রিকার জনগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে আমাদের দেশে যাঁদের আদিবাসী বলা হয়, তাঁদের মিলের কথা ভেবেই বলছি।

আরও একটা কথা। এশিয়ার আদিবাসী উপজাতিদের তুলনায় আফ্রিকায়, বিশেষত জামবেসি-দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষজন, গত পঞ্চাশ বছরে দ্রুত আয়ত্ত করেছে আধুনিক জীবনযাত্রা। ওখানকার পরিবর্তনের মূল ধারাটিতে আধুনিক শিক্ষার ভূমিকা বুঝতে পারলে আমাদেরও সুবিধে হবে।

সমীক্ষার সমস্যা

বর্তমান প্রবন্ধটি একটি সমীক্ষা আর তার ফলাফল নিয়ে। "জিমবাবুয়ের অধুনায়নে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্য-বোধের পরিবর্তনে শিক্ষার মাধ্যমে পশ্চিমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভূমিকা"—এই হচ্ছে সমীক্ষার বিষয়।

ঠাণ্ডা মাথায় সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা করা মহা-সমস্যা-জনক হয়ে উঠতে পারে। আমি উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রসঙ্গেই বলছি। কখনও-কখনও প্রাণ হাতে করেও এসব কাজে নামতে হয়। জিমবাবুয়ের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়ে ১৯৭৭ সালে তৎকালীন রোডেশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্র-সমীক্ষক প্রাণ হারান। অথচ তাঁদের কাজ-কর্মের ফলাফল বিপ্লবোত্তর যুগেও মূল্যবান।

ভেবে দেখুন, ১৯৬৯-৭০ সালে মুজিবের চাপে পূর্ব-পাকিস্তানে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রচারকদের দশা। রাওয়াল-পিণ্ডির বিরুদ্ধে জনসংখ্যাই তখন লড়াইয়ের এক মস্ত হাতিয়ার। অথবা ১৯৬৬-৬৭ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তুঙ্গকালে চীনদেশে যাঁরা আজকের মতো বড়োদের সমীহ করার কথা বলতে গেছেন, তাঁদের কথা। অথচ স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়ার জয়গান ওদেশে সঠিকভাবেই নিত্য উচ্চারিত (ছিল)।

আসলে জনজাগরণ বা বিপ্লবের কালে পুঞ্জীভূত আবেগেরই একটা বিস্ফোরণ ঘটে। সমাজতাত্ত্বিকদের শীতল নিরপেক্ষতা সন্দেহ জাগায় তখন। 'তুমি আমার দলে নও? তাহলে তুমি নির্ঘাত শত্তুর!'

জিমবাবুয়ের এই সমীক্ষাটি সেদিক থেকে এক দুঃসাহসিক কাজ। তখন সরকার, আপিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, চার্চে পশ্চিমী-দের প্রভুত্ব। তাদের বিরুদ্ধে আবেগটাও কম নয়। তবে বন্দুকের নল নিয়ে মারমুখী হবার চূড়ান্ত যুগে সমীক্ষাটি হয় নি। গ্রাম-জিমবাবুয়ে তখনও উত্তাল হয় নি, এই রক্ষে।

সমীক্ষা-পদ্ধতি

আলোচ্য সমীক্ষার জন্যে জিমবাবুয়ের তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে চারটি গ্রুপকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। একদম কোনো ইস্কুল বা চার্চের প্রভাব না থাকা থেকে শুরু করে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা এই সমীক্ষার আওতায় আছে।

এক। জিমবাবুয়ের উত্তর-পুব সীমানায় মাজোয়া নদীর ধারে একটি গ্রামের কয়েকজন নারীপুরুষ নিয়ে প্রথম গ্রুপ। পশ্চিমী সভ্যতা এই গ্রামে তখন যায় নি বললেই চলে। কোনো ইস্কুল-চার্চ নেই, দোকানপাট নেই, রাস্তাঘাটও তথৈবচ। রাজধানী স্যলস্‌বেরি (বর্তমান নাম হারারে) প্রায় ২৫০ কিমি দূরে। প্রায় ৫০ কিমি পায়ে-হাঁটা জঙ্গলের পথ ভেঙে গ্রামে ঢুকতে হয়। অধিবাসীদের জীবিকা শিকার করা, মাছ ধরা এবং জোয়ার-জাতীয় কিছু শস্য উৎপাদন করা। এ ছাড়া শাক-পাতা, কুমড়ো, তরমুজ-জাতীয় কিছু সবজি। নগদ পয়সার ব্যবহার অতি সামান্য। লোকসংখ্যা মাত্র আশি।

তাদের সঙ্গে ভাব করে প্রশ্নোত্তর আদায় করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়েছিল। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত জনাদশেক স্ত্রী-পুরুষের সহযোগিতা পাওয়া যায়।

দুই। হারারে থেকে আর-এক প্রান্তে ২৫০ কিমি দূরে নিয়াহুকু গ্রাম। নিকটতম মিশন এবং সরকারি শাসনকেন্দ্র ১১০ কিমি দূরে। সমীক্ষার পাঁচ বছর আগে ওই গ্রামে একই সঙ্গে একটা চার্চ, একটা ক্লিনিক আর একটা প্রাইমারি ইস্কুল তৈরি হয়েছে। সবগুলোই দুই সংস্কৃতির

বাহক শিক্ষিত আফ্রিকানদের দ্বারা চালিত। দূরের মিশন-কেন্দ্র থেকে ইওরোপীয় সুপারভাইজার আসেন মাসে একবার। স্থানীয় একজন আফ্রিকানের মালিকানায় একটা দোকান আছে গ্রামে। সেখানে চা, চিনি, টিনের খাবার, কোল্ড ড্রিংক, আয়না-চিরুনি, সুঁচসুতো থেকে শুরু করে বাসনপত্র, কাপড়চোপড়—সবই পাওয়া যায়। দোকানটা একটা বাসরুটের টারমিনাস-ও বটে। গ্রামের লোকের জীবিকা পশুপালন এবং প্রান্তিক চাষবাস। তাও কিন্তু ঝুমচাষ। এক জমিতে বছর তিনেক চাষ করে পতিত রাখা, জঙ্গল সাফ করে পুড়িয়ে নতুন জমিতে চাষের পত্তন। গ্রামের মানুষদের গর্ব সেখানে পাঁচ-পাঁচ জন নামকরা ওঝা (ng'anga) আছে। তাদের একজন আবার মহিলা।

এখানকার ইস্কুলের পঁচিশজন ছাত্র-ছাত্রীর লিখিত প্রশ্নোত্তর দেওয়া ছাড়া গ্রামের বয়স্ক দশজনের মৌখিক সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় মাজোয়া গ্রামের মতো।

তিন। চতুর্থ এবং শেষ গ্রুপ হচ্ছে ম্রেওয়া সেকেনডারি ইস্কুলের অষ্টম আর নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের একশ জনকে নিয়ে।

সমীক্ষার সময়ে ইস্কুলটার বয়স যদিও মাত্র দু বছর, স্থানীয় মিশনকেন্দ্র এবং প্রাইমারি ইস্কুল চালু হয়েছে সেই ১৯২৩ সালে। হারারে থেকে মোটামুটি ভালো রাস্তায় ৮০ কিমি দূরে এই গ্রাম। স্থানীয় মানুষ প্রধানত প্রান্তিক চাষি, তবু কিছু নগদা ফসলও হয়।

এই একশ ছাত্রছাত্রীর পঞ্চাশজনের সমীক্ষা নেওয়া হয় স্থানীয় "সোনা" ভাষায়, বাকি পঞ্চাশ জনের ইংরিজিতে। ধরে নেওয়া হয়েছিল মাতৃভাষায় যারা উত্তর দিচ্ছে, তারা চিরকালীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেবে বেশি। পরে তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের পরিবর্তনের পরিমাপ করার জন্যে বারোটি বিশেষ প্রশ্ন তৈরি করা হয়। বারোটি গল্প, তার প্রত্যেকটির শেষে তিনটি করে বহু-নির্বাচনী (multiple choice) পরিসংহার। একটিকে বেছে নিতে হবে। বারোটি গল্পকে ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছিল: প্রশাসন, চিকিৎসা, ন্যায়নীতি, বিয়ে-বিয়েবিচ্ছেদ, চাষ-আবাদ এবং ধর্মবিশ্বাস। উত্তরের তিনটি পছন্দের মধ্যে একটি চিরকালীন (traditional), একটি নিরপেক্ষ এবং একটি আধুনিক মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। যারা এর বাইরে নিজস্ব মন্তব্য বা উত্তর জুড়ে দিয়েছিল, তার আলাদা মূল্যায়ন করে চিরকালীন, নিরপেক্ষ বা আধুনিক বিভাগে বিচার করা হয়।

সমীক্ষার শেষে অবশ্য প্রশ্নগুলির কিছু দোষত্রুটি ধরা পড়ে।

প্রশ্নগুলো এখানে সাজিয়ে উপস্থিত করলেও, সমীক্ষার সময়ে উলটোপালটা করে দেওয়া হয়েছিল।

ফলাফল

১ প্রশাসন

[ক] টেমবো জঙ্গলের মধ্যে একটা জলায় রোজই আসতে দেখে মস্ত এক কুডুকে। সেটাকে শিকার করতে ইচ্ছে হল টেমবোর। কী করে করবে?

১) গ্রামের মোড়লের অনুমতি নেবে?

২) লুকিয়ে শিকার করবে?

৩) জেলার কমিশনারের কাছ থেকে শিকারের লাইসেনস নেবে?

[সরকারি বিশেষ অনুমোদন ছাড়া বড়ো জন্তু শিকার বেআইনি। একটা মজার জবাব: আগে ওটাকে খতম করে তবে মোড়লকে খবর দেবে!]

[খ] মারোয়ে হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে ভাবল পুলা তার খাবারে বিষ মিশিয়েছে। এখন তার কী করা উচিত?

১) বাবাকে বলবে গুনিন্ ডেকে তার অসুখের কারণ বের করতে?

২) পুলার কাছে যাবে এবং নিজেই খোলাখুলি জিজ্ঞেস করবে?

৩) পুলিশে খবর দেবে?

[এই প্রশ্নটায় প্রশাসন এবং চিকিৎসা দুটোরই খানিক মিশ্রণ আছে। বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী হাসপাতালে যাবার কথা লিখেছে। এক মহিলা বললেন, ব্যাপারটা চেপে যাওয়া উচিত—বড়ো গুনিনের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত।]

২ চিকিৎসা

[ক] রুডো নদীর ধারে খেলবার সময় লক্ষ করল তার এবং সঙ্গীদের প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত। এখন রুডো কী করবে?

১) বাবাকে বলবে গুনিনের কাছ থেকে ওষুধ আনতে?

২) বাবাকে বলবে দোকান থেকে বলবর্ধক রক্তশোধক কোনো ওষুধ আনতে?

৩) হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাবে এবং আর কখনো নদীর জলে খেলা করবে না বা সেই জল পান করবে না?

[সব গ্রুপের উত্তরেই 'আধুনিক' প্রতিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে বেশি।]

[খ] টেনডাই-এর ছোট্ট বোনটা হরদম কাঁদে। বাচ্চাটা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রায়ই তার পেট খারাপ। টেনডাই-এর মায়ের এখন কী করা উচিত?

১) টেনডাই-এর বাবাকে বলবে গুনিনের কাছ থেকে মাদুলি এনে মেয়েটির কোমরে বেঁধে দিতে?

২) এমনিতেই সেরে যাবে?

৩) হাসপাতালে বাচ্চাটিকে নিয়ে যাবে, ওষুধ খাওয়াবে, পরিষ্কার রাখবে, মাছি-টাছি বসতে দেবে না খাবারে?

[দুটো প্রশ্নের উত্তরেই আধুনিক চিকিৎসার উপর সব গ্রুপের বেশি নির্ভরতা। তবু মাদুলি এবং আধুনিক চিকিৎসা, দুটোতেই ভরসা আছে অনেকের।]

৩ ন্যায়নীতি

ক) মি. ন্ডেভু অন্য গ্রামের মি. মবিজিকে একটা গাধা বেচলেন। গাধাটা সুস্থ এবং অল্পবয়সী বলেই চালালেন। মুজুকুরু, ন্ডেভুর ভাইপো, বিক্রির ব্যাপারটা দেখল। সে জানত গাধাটা বেশ অসুস্থ। মি. মবিজি নিজের গাঁয়ে ঢুকবার আগেই গাধাটা মারা গেল। সে পুলিশের কাছে নালিশ করল। যখন মুজুকুরুকে সাক্ষী দিতে ডাকা হল। তখন সে কী করবে?

১) সে কোর্টে যাবে এবং বলবে গাধাটা সুস্থই ছিল?

২) মামলা চলা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে. যাতে সাক্ষী দিতে না হয়?

৩) সে বরং কোর্টেই যাবে, কাকাকে জেলে যেতে হলেও সত্যি কথা বলবে?

[একটি ছেলের মন্তব্য: ওকে শমন পাঠানো ঠিক হলেও, ও যেন (পরিবারের প্রতি) বিশ্বাসঘাতকতা না করে।—

ইস্কুলের শিক্ষা যে আত্মীয়-আনুগত্য কমিয়ে দিচ্ছে, তার প্রমাণ আছে।]

খ) খোমো মায়ের কাছ থেকে পাঁচ শিলিং নিয়ে গেল চা-চিনি কিনবার জন্যে। দোকানদার ছিল খুব ব্যস্ত। ভুল করে ওকে দশ শিলিং খুচরো ফেরত দিল। এখন খোমো কী করবে?

১) টাকাটা নিয়ে নেবে এবং মা-কে দিয়ে দেবে?

২) টাকাটা পকেটস্থ করবে, দোকানদার ভুল টের পাবার আগেই কেটে পড়বে, পরে নিজেই খরচ করবে?

৩) দোকানদারকে টাকাটা ফেরত দেবে?

[প্রশ্নটা একদিক থেকে চিরকালীন বনাম আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরীক্ষক নয়। একটা ভালোমন্দ-বোধের ব্যাপার। প্রাচীন সোনা সমাজে এই শিক্ষা যথেষ্ট ছিল। তবে আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে সততার প্রতি সমর্থন স্পষ্ট হয়েছে।

কয়েকটা বিশেষ উত্তর: ১) দোকানদারকে টাকাটা ফেরত দিয়ে সততার জন্যে পুরস্কার চাইবে। ২) ওই দোকান থেকেই ওই পয়সায় কিছু কিনে নেবে। ৪) 'যা পেয়েছ নিয়ে নাও, পিতৃপুরুষের আত্মারা দুবার এ সুযোগ দেবে না!']

৪ বিয়ে

ক) পছন্দ-করা কনে

সোন্জো পাশের গ্রামের নিয়াসার প্রেমে পড়েছে। বাবাকে সে অনুরোধ করল কন্যাপণ দিয়ে দিতে। কিন্তু বাবা আর আত্মীয়স্বজনের মতে নিয়াসা ভালো বউ হবে না। তারা অন্য মেয়ে পছন্দ করল। সোন্জো এখন কী করবে?

১) আত্মীয়দের পছন্দমত বিয়ে করবে?

২) আত্মীয়দের কথায় রাজি হবে না, এবং বলবে এখন তার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই?

৩) পছন্দ-করা মেয়েটিকে নিয়েই থাকবে, যাতে আত্মীয়রা ওদের বিয়েতে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়?

সোনাদের রীতিতে বর-কনের দুই পরিবারই বিয়ের ব্যাপারে প্রধান। তবে কনের মত অবশ্যই চাই। বরের মতের তত প্রাধান্য নেই। ছেলেমেয়ের মতামতের জন্যে কোনো বিয়েই শেষ পর্যন্ত নাকচ হতে পারে না। ওদের একরকম নিমরাজি করিয়ে নেওয়া হয়।

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মাধ্যমিক ইস্কুলের ছেলেরাই কিন্তু চিরকালীন রীতির পক্ষে ভোট দিয়েছে বেশি। সম্ভবত

তাদের বিয়ের বয়স হয়ে এসেছে বলেই। একজন তো স্পষ্টই লিখেছে—বাবার অমতে বিয়ে করলে কন্যাপণটা কে দেবে শুনি ?

তাদের চিরকালীন মনোভাবের একটা কারণ হয়তো চার্চের শিক্ষা। পাদরিরা হরণ করে বিয়ের বিরুদ্ধে বলে থাকেন। কেউ-কেউ আত্মীয়স্বজন এবং গ্রামের বয়স্কদের সঙ্গে আলোচনার উপর জোর দিয়েছে, যাতে একটা আপোস হয়।

নিয়াহুকু গ্রামের ছাত্রছাত্রী এবং বয়স্করা হরণ করে বিয়ের বিশেষ বিপক্ষে নয়। ওই অঞ্চলে ব্যাপারটা তখনও বেশ চালু। ওখানকার বয়স্কদের সহনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় এই মন্তব্যে : ছেলের মতামতকে মেনে নেওয়া উচিত। কন্যাপণের টাকা (বা গোরু) দিয়ে দেওয়া উচিত।

নিয়াহুকুর দুটি ছাত্রের মন্তব্য : ১) আমি যদি কোনো মেয়েকে চাই, জান না গাছ তার শেকড় নামাবেই যেখানে তার খুশি। ২) দুটি মেয়েকেই বিয়ে করা উচিত।

খ) বিবাহবিচ্ছেদ

মুরুমে এবং মুকাডজি বিয়ের পর থেকেই ঝগড়াঝাঁটি নিয়ে আছে। মুরুমে একদিন তার বউকে জোর পিটুনি দিল। হাত ভেঙে দিল। বউকে হাসপাতালে যেতে হল। বউ, মুকাডজি এখন কী করবে ?

১) শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কিতদের কাছে নালিশ করবে ?

২) বাপের বাড়ি যাবে এবং বাবাকে বলবে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করবে ?

৩) জেলার কমিশনারের কাছে যাবে এবং স্বামীর নৃশংসতা সম্পর্কে নালিশ করবে ?

দ্বিতীয় প্রশ্নটি ঠিক নিরপেক্ষ নয়, চিরকালীন ধারারই অনুসারী। সোনা সমাজের রীতি অনুযায়ী শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কিতদের কাছ থেকে সুবিচার না পেলে বাপের বাড়িতেই যেতে হয়। স্বামীর অধিকার আছে বউকে অল্পস্বল্প মারধোর করার। কিন্তু 'অযৌক্তিক' এবং গুরুতর পিটনিটা নৃশংসতার সামিল, অপরাধ। সেক্ষেত্রে বাপের বাড়িতে বউয়ের পালিয়ে যাওয়া এবং বিচ্ছেদ চাওয়া রীতিমাফিক বটে।

[সেকেনডারি স্কুলের ছেলেমেয়েরা কিন্তু এই ব্যাপারে অন্যদের তুলনায় বেশ পুরনোপন্থী !]

৫ চাষবাস

ক) গত বছর মি. গুরুরের জমিতে ভুট্টার ফসল তেমন সুবিধের হয় নি। সারাবছরের খোরাকিই হয় নি। এ বছর চাষের সময় ওঁর কী করা উচিত ?

১) ভালো-করে চোলাই-করা তাড়ি দিয়ে বাস্তুদেবতা এবং পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করবে ?

২) নতুন একটা জমি সাফ করে চাষ করবে ?

৩) সার এবং কমপোস্ট ব্যবহার করবে আগের জমিতেই ?

[নিয়াহুকু গ্রামের অধিকাংশই 'নিরপেক্ষ' জবাবের দলে। ওই অঞ্চলে ঝুমচাষ তখনও বেশ চালু।

একজনের মন্তব্য বেশ আকর্ষক—'যদি ব্যাপারটা কয়েক বছর ধরে হতে থাকে, তাহলে পূর্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে বিশেষ তর্পণের আয়োজন করা উচিত।']

খ) শ্রীমতী বামবো অসুস্থ। মাঠের কাজ করে উঠতে পারছেন না। তাঁর স্বামীর এখন কী করা উচিত ?

১) আরেকটা বিয়ে করবেন ?

২) জমিতে কাজ করবার জন্যে মুনিষ-মাহিনদার লাগাবেন ?

৩) ছেলেপুলে নিয়ে নিজেই কাজে লেগে পড়বেন স্ত্রীর বদলে ?

[দ্বিতীয় প্রশ্নটিকে ঠিক নিরপেক্ষ না বলে বরং আধুনিক বলা যায়। তৃতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে, স্বামীর পক্ষে রান্নাবান্না এবং ছেলেপুলে দেখাশুনো করাটা "অমর্যাদাকর" হলেও স্ত্রীর চাষের কাজে সময়বিশেষে সাহায্য করাটা চিরকালীন রীতিতেও আছে। মাজোয়ে গ্রামে শতকরা আশি ভাগ জবাবই আরেকটি বিয়ের অনুকূলে। চিরকালীন রীতিতে স্ত্রী সন্তানধারণ এবং অন্যান্য কর্তব্যকর্মে অপারগ হলে স্বামী আবার বিয়ে করতে পারেন অথবা শ্বশুরকে বলতে পারেন আরেকটি মেয়ে (শালী বা শালী-স্থানীয়া) দিয়ে "ক্ষতিপূরণ" করতে। সেক্ষেত্রে কন্যাপণ লাগবে না।]

৬ ধর্ম-বিশ্বাস

ক) মি. মুডিসি শিকারে বেরিয়ে একটাও শিকার পেলেন না। কারণটা কী ?

১) তিনি পূর্বপুরুষদের আত্মাকে তর্পণ করে সন্তুষ্ট রাখেন নি।

২) তাঁর কপাল খারাপ।

৩) নদীগুলো শুকিয়ে গেছে। জানোয়াররা জলের খোঁজে গেছে অন্যত্র।

["খারাপ কপাল"-এর ব্যাপারটা আদিম আর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাঝামাঝি। দুটো গ্রামের বয়স্করা মূলত চিরকালীন কারণের পক্ষে।]

খ) পরপর দু বছর মাকুনি সর্দারের এলাকায় ভালো বৃষ্টি হয় নি। দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি। কিন্তু কেন ?

১) লোকে ঠিকমতো পুজো-আচ্চা না করায় গ্রামদেবতা রুষ্ট, বৃষ্টি পাঠাতে নারাজ।

২) ভগবান বৃষ্টি পাঠান নি।

৩) বাতাস বৃষ্টির মেঘ বয়ে আনে নি।

[প্রথম উত্তর চিরকালীন। দ্বিতীয়টি খ্রীষ্টীয় শিক্ষার অন্তর্গত। এটাকে রূপান্তরিত বিশ্বাস বলা যেতে পারে। সোনা ভাষায় ভগবান মোয়াবি। গ্রাম দেবতা Mhondoro। খ্রীষ্টীয় চার্চে মোয়াবি কথাটা ব্যবহার করা হয় (সর্বশক্তিমান একমেবাদ্বিতীয়) ভগবান অর্থে।

কয়েকটি আকর্ষক জবাব : ১) ভগবান বৃষ্টি পাঠান নি, কিন্তু বৃষ্টির আসল মালিক তো Mhondoro। ২) ভূগোলে পড়ানো হয় বাতাস বৃষ্টি আনে। কিন্তু বাতাসও তো ভগবানের।

৩) পাপের "বেতন" অনাবৃষ্টি।

ইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসে বিভ্রান্তি স্পষ্ট। বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় শিক্ষা এবং চিরকালীন শিক্ষার মধ্যে মিল করবার চেষ্টায়।]

সমস্ত বিভাগের ফলাফল এবার একসঙ্গে দিলাম।

বিভাগ ১—৬ জবাব	মাজোয়ে	মোট জবাব নিয়াহুকু গ্রাম	নিয়াহুকু প্রাঃ স্কুল	১২টি গল্প ম্রেওয়া ইস্কুল মাধ্যমিক
চিরকালীন	১৬·৭	৪০·৮	১২·৭	১৪·৯
নিরপেক্ষ	১০·৮	২১·৭	২৮·০	১৪·৭
আধুনিক	১২·৫	৩৭·৫	৫৯·৩	৭০·৪
মোট	১০০·০	১০০·০	১০০·০	১০০.৪
সংখ্যা—	১০	১০	২৫	১০০

গল্পের মাধ্যমে এই সমীক্ষার একটা বড়ো ত্রুটি কাজের সময় এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেওয়া হবে কিনা জানা যায় না। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে বিয়েতে পণ নেওয়া অথবা উৎসবে সাধ্যাতীত খরচ হওয়া সম্পর্কে মুখে ভোট হয়তো অনেকেই দেবে, কিন্তু কাজের বেলায় উলটোটি। এ তো হামেশাই হচ্ছে।

তবে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যে হচ্ছে জিমবাবুয়েতে, এই সমীক্ষায় তা স্পষ্ট। এই পরিবর্তনে স্পষ্টতই আধুনিক শিক্ষার ভূমিকা অনেক। উন্নয়নের অন্য বাহকগুলোর সঙ্গে যুক্ত হলে উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা সমাজে দ্রুত পরিবর্তন আনতে পারে সন্দেহ নেই।

বলা বাহুল্য, পরিবর্তনের পাশাপাশি প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে সংঘাত, মূল্যবোধ নিয়ে বিভ্রান্তি এবং যন্ত্রণাও কম নয়। তবে সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

[পাদটীকা : সমীক্ষাটি হারারে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের একটি ছাত্রীর "শিক্ষার সমাজতত্ত্ব" বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার অংশ। আমাদের দেশের বিটি কলেজগুলোতে এমনতর কার্যকলাপ কি চালু করা সম্ভব নয় ?]

বিবেক যুক্তি ও প্রগতি : কয়েকটি প্রসঙ্গ, কিছু মন্তব্য

আবুল কাসেম ফজলুল হক

সমাজ পরিবর্তিত হয়, সমাজের আইনকানুন বদলায়, আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা বিবর্তিত এবং রূপান্তরিত হয়। এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠিগত, দলীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ-অপছন্দ আর সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় সাধারণত মানুষ নিষ্ক্রিয় থাকে না, এবং কোনো মানবীয় পরিবর্তনই সাধারণত সম্পূর্ণরূপে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে ঘটে না। "ইতিহাসের অচেতন শক্তি" বলে যে শক্তিকে নির্দেশ করা হয়, সামাজিক ইতিহাসে সেই শক্তি সম্পূর্ণ অন্ধ কিংবা সম্পূর্ণ অজ্ঞ অথবা সম্পূর্ণ অচেতন থাকে না, সার্বভৌম কিংবা নিরঙ্কুশও হয় না। যাকে বলা হয় "মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নিরপেক্ষ অনিবার্যতা", মানুষের ইতিহাসে তাও সৃষ্টি হয় বহুলাংশে মানুষেরই কর্মফলরূপে —নিজের না-হয় অপরের নতুবা উভয় পক্ষের কর্মফল। ইতিহাসে "আপতন" বলে যেসব ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়, সামাজিক ইতিহাসে সেইসব ঘটনাও কার্য-কারণনিয়মের এবং মানবীয় নিয়ন্ত্রণসীমার সম্পূর্ণ বাইরে নয়।

সামাজিক ইতিহাসের গতিধারা লক্ষ করলে দেখা যায়, সমাজের কোনো-কোনো পরিবর্তন অল্প-কিছু লোকের পক্ষে লাভজনক হলেও বিপুল জনগণের পক্ষে লাভজনক হয় না, দেশে-দেশে পরিবর্তন জনগণের জন্য আপাতদৃষ্টিতে মঙ্গলকর হলেও পরিণামে ক্ষতিকর হয়, আর কোনো পরিবর্তন জনগণের জন্য প্রকৃতপক্ষেই মঙ্গলকর হয়। সমাজের যে পরিবর্তনের গতি বিপুল জনগণের জন্য যথাসম্ভব দীর্ঘস্থায়ী এবং অধিক মঙ্গল অর্জনের অনুকূল হয়, তাকেই আমরা প্রগতি বলি।

প্রগতি "ইতিহাসের অচেতন শক্তি"র দ্বারা কিংবা "মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে" অথবা "আপতিকভাবে" ঘটে না ; প্রগতির জন্য জনসাধারণের সতর্ক চেষ্টার দরকার হয়।

প্রগতিশীল নেতৃত্ব সৃষ্টিতেও জনসাধারণকে সতর্কভাবে দায়িত্ব পালন করতে হয়। জনসাধারণ অসতর্ক হলে, গড্ডলপ্রবাহে ভেসে চললে, হুজুগে মত্ত হলে, ভাঁওতায় সাড়া দিলে খারাপ নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে ; এবং তার ফলে বিশেষ-বিশেষ ঐতিহাসিক কালের প্রগতির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে প্রগতিসাধনার্থে জনগণের কর্মধারায় এবং সংগ্রামে নেতৃত্বদানের জন্য নেতৃপক্ষের সদস্যদের সতর্কভাবে কিছু গুণের অনুশীলন করতে হয়। এই অনুশীলন না থাকলে নেতৃপক্ষের লোকেরা, প্রগতির নামে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালালেও, শেষ পর্যন্ত বিপথগামী হয়ে যেতে পারেন, এবং জনসাধারণকেও বিপথে পরিচালনা করতে পারেন, কিংবা হীনস্বার্থসাধনে মগ্ন হয়ে সরাসরি জনসাধারণের ক্ষতি করতে পারেন।

প্রবন্ধটি বাংলাদেশে বিরাজমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একান্তভাবেই বাংলাদেশের পাঠকদের উদ্দেশে রচিত। তবে এই প্রবন্ধে বিবৃত মূল বিষয়গুলোর সর্বজনীন উপযোগিতা আছে, পশ্চিমবঙ্গের পাঠকগণও হয়তো এগুলোকে নিজেদের মতো করে গুরুতর চিন্তার উপযোগী বিষয়রূপে বিবেচনা করতে পারেন।

—লেখক

বাংলাদেশ থেকে

গুণবান হওয়ার সম্ভাবনা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে, কিন্তু জন্মগতভাবে কেউই গুণবান হয়ে আসে না, জীবনে কষ্টকর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে গুণ অর্জন করতে হয়। প্রগতির সম্ভাবনাও সব সমাজেই অন্তর্নিহিত থাকে ; কিন্তু কোনো সমাজেই প্রগতি মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে—সজ্ঞান, সতর্ক, সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত চেষ্টা ব্যতিরেকে আপনিতেই ঘটে না।

সমাজের ন্যায়কামী, মুক্তিকামী, উন্নতিকামী, প্রতিভাবান, শক্তিমান, সৃজনাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা সজ্ঞানে, সতর্কভাবে, কষ্টসাধ্য অনুশীলনের মাধ্যমে জনগণের সহায়তায় প্রগতির ধারা সৃষ্টি করেন। প্রগতিবিরোধী ধারা শক্তিশালী হয় তখনই যখন তা জনসাধারণের সমর্থন আদায় করতে পারে।

শোষণ এবং আধিপত্যকে মানুষ কখনও মেনে নেয় না। অন্যায়-অবিচার, শোষণ-পীড়ন এবং প্রভুত্বের বিরুদ্ধে চিরকাল জনসাধারণ সংগ্রাম করেছে, আজও করছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম সাধারণত শুভকর পরিণতিতে পৌঁছয় না। শুভকর পরিণতির জন্য দরকার হয় বিবেকসম্মত যুক্তিসঙ্গত কর্মপন্থা আর ভালো নেতৃত্ব। কোনো সমাজে ভালো নেতৃত্বের উদ্ভব তখনই সম্ভব হয় যখন সেই সমাজের—অনুসারী আর নেতৃত্ব—দুই পক্ষের লোকদের মধ্যেই সজ্ঞান, সুচিন্তিত, দূরদর্শী, সুপরিকল্পিত, সতর্ক প্রয়াস দেখা দেয়—দেখা দেয় স্বতঃস্ফূর্ত উন্মত্ততার আর সুবিধাবাদের স্থলে মহৎ মানবীয় গুণাবলী অর্জনের পারম্পর্যশীল, দুরূহ, কষ্টকর অনুশীলন। অন্যায়-অবিচার, শোষণ-পীড়ন এবং প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে, পারস্পরিক সহযোগিতার উপর ভিত্তিশীল শোষণমুক্ত, সমৃদ্ধ, সুন্দর সমাজ-জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীর সর্বত্র সর্বপ্রকার মানবীয় কর্মকাণ্ডে দরকার স্বতঃস্ফূর্ততার স্থলে মহৎ মানবীয় গুণাবলীর ব্যক্তিগত তথা যৌথ অনুশীলন। উৎকর্ষ সম্পর্কে কৌতূহল, জ্ঞান আর সতর্কতা ব্যতীত এবং উৎকর্ষের অনুশীলন ব্যতীত উৎকৃষ্ট কিছু সৃষ্টি করা যায় না। ভালো ফল লাভের জন্য সবকিছুই শিখতে হয়, মাতৃগর্ভ থেকে কেউই কিছু শিখে আসে না। আর চেষ্টা করলে মানুষ অভ্যাস বদলাতে পারে, যা অসাধ্য মনে হয় তাও অনেক সময় সাধন করা সম্ভব হয়। ইংরেজিতে প্রবাদ আছে : Man can do what man has done। মানুষ যা করেছে, মানুষ-যে কেবল তাই করতে পারে, তা নয় ; মানুষ যা করে নি তাও মানুষ করতে পারে ; মানুষের আবিষ্কার-উদ্ভাবনের শক্তি অনন্ত।

বাংলাদেশের সমাজে যেসব দল এবং গোষ্ঠী প্রগতিশীল বলে আত্মপরিচয় দেয়, দীর্ঘকাল যাবৎ তাদের মধ্যে মানবীয় গুণাবলী সম্পর্কে সচেতনতার একান্ত অভাব দেখা যায়। অথচ মহত্তর মানবীয় গুণাবলীর অনুশীলন ত্যাগ করে শুধু আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের কর্মসূচী নিয়ে কিংবা গতবাঁধা কেতাবি বক্তব্য নিয়ে কোনো দল বা গোষ্ঠী সমাজপ্রগতির সংগ্রামে সফল হতে পারে না, এমনকি নিতান্ত দলীয় বা গোষ্ঠীগত ঐক্যও রক্ষা করে চলতে পারে না। দল বা সংগঠনের সদস্যদের মানবীয় গুণাবলীই দলের বা সংগঠনের সংহতিশক্তি। মানবীয়-গুণাবলীর-অনুশীলন-বিরহিত লোকেরা যে ঘোষণাপত্র নিয়েই সংগঠিত হোক, তাদের মধ্যে সংহতি সৃষ্টি হয় না। আমাদের দেশের "প্রগতিশীল দলগুলো"র (?) আভ্যন্তরিক অবস্থার কথা ভাবতে গেলেই স্মরণে আসে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি :

> বিচ্ছিন্ন জিনিস জড়ের মতো পড়িয়া থাকিলে তবু টিকিয়া থাকে, কিন্তু কোনো উপায়ে কোনো বায়ুবেগে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তাহার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে, তাহার অভ্যন্তরের সমস্ত দুর্বলতা নানা মূর্তিতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়।

স্নেহ, প্রেম, শ্রদ্ধা, বন্ধুত্ব, বাৎসল্য, সৌহার্দ্য, সৌজন্য, সহযোগিতা, সহানুভূতি, উপচিকীর্ষা, সৎসাহস, সত্যাগ্রহ, ন্যায়বোধ, সৌন্দর্যবোধ, কল্যাণবোধ, বিবেক, দূরদর্শিতা, শ্রমশীলতা, সহিষ্ণুতা, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞানানুরাগ, যুক্তিবোধ, নৈতিক চেতনা, আদর্শবোধ, বিচারপ্রবণতা, মুক্তবুদ্ধি, গ্রহণশীলতা, দানশীলতা, যুক্তিনিষ্ঠা, সুনীতিনিষ্ঠা, আদর্শপরায়ণতা—এ সবেরই সমষ্টিগত নাম মানবীয় গুণাবলী।

আমার মতে, প্রগতির লক্ষ্যে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের সমাজে যেসব গুণের অনুশীলন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেগুলোর মধ্যে বিবেকচালিত যুক্তিপরায়ণতার স্থান শীর্ষে। আমি মনে করি, যদি দেশের প্রগতি-অভিলাষী নেতা আর কর্মীদের মধ্যে এবং মুক্তিকামী জনসাধারণের মধ্যে বিবেক আর যুক্তিবোধ বিকশিত না হয়, এবং বিবেকচালিত যুক্তিপরায়ণতা অন্ধবিশ্বাসের, গোঁড়ামির, হুজুগপ্রিয়তার এবং গড্ডলবৃত্তির স্থলাভিষিক্ত না হয়, তাহলে কল্যাণের বড়ো কোনো সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হবে না।

বাংলাদেশের সমাজে, বিশেষ করে "প্রগতিশীল শক্তি-গুলো"র (?) মধ্যে যুক্তিপরায়ণতার অভাব অত্যন্ত প্রকট। এ সমাজে প্রায় সর্বত্রই অদূরদর্শী, আবেগসর্বস্ব, হীনস্বার্থ-প্রণোদিত প্রয়াসের চাপে যৌক্তিক উদ্যোগগুলি মাথা তুলতে পারে না। তার ফলে প্রগতির সম্ভাবনা ব্যর্থ হয়। বিচারবিবেচনাহীন, আত্মজিজ্ঞাসাহীন, প্রশ্নহীন, স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের পরিণতি প্রায়শ ক্ষতিকর হয়। বিভিন্ন মতাদর্শের আর ধর্মের লোকেরা অন্ধবিশ্বাস, বদ্ধদৃষ্টি এবং গোঁড়া মনোভাব অবলম্বন করে চলবার, অন্যদেরকে চালাবার যে চেষ্টা করেন তার পরিণতিও ক্ষতিকর হয়। এজন্যই

প্রগতির স্বার্থে আজ আমাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল যুক্তির স্বরূপ এবং প্রকৃতি বুঝতে চেষ্টা করা, এবং ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সকল কাজে যুক্তির অনুশীলন করা। যুক্তি ব্যাপারটিকে গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করলেই যুক্তি-অনুশীলনের গুরুত্বও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বাইরের নানা বস্তু এবং ঘটনা ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কে ক্রিয়া করে। তার ফলে আমাদের চেতনা (আপন সত্তায় বাহ্যজগৎকে ও অন্তর্জগৎকে অনুভব করার এবং কোনো কিছুর স্পর্শে বা প্রভাবে সাড়া দেওয়ার শক্তি) জেগে ওঠে। সে অবস্থায় কোনো কিছু অর্জনের জন্য, কোনো কিছুকে ভোগ করার কিংবা ধ্বংস করার জন্য আমাদের অন্তরে প্রবল ইচ্ছা জাগে। এই ধরনের প্রবল ইচ্ছাই আবেগ। জেগে-ওঠা চেতনায় আবেগের পাশাপাশি একটা বিচারবোধও উঁকি দেয়। বিচারবোধকে সজ্ঞানে সযত্নে সতর্কভাবে লালন এবং বর্ধন করতে হয়, তা না হলে আবেগ তাকে বিকশিত হতে দেয় না। তা ছাড়া বিবেক বলেও একটা সত্তাকে আমরা আমাদের চেতনায় অনুভব করি। বিবেক হল সেই শক্তি যা আমাদেরকে ন্যায়, সুন্দর এবং কল্যাণের পথে চলতে, এবং অন্যায় অসুন্দর এবং অকল্যাণের পথ থেকে বিরত থাকতে তাড়না দেয়।

সাধারণত আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়েই মানুষ কাজ করে। তবে বিচারবিবেচনা ও বিবেকের অনুমোদন ছাড়া শুধু আবেগ দ্বারা চালিত হয়ে কাজ করলে তার পরিণাম প্রায়শ অমঙ্গলকর হয়।

রাজনৈতিক নেতারা নানা উদ্দেশ্যে নানাভাবে জনগণের অন্তরে আবেগ সৃষ্টি করেন। জনসাধারণ নেতাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের আবেগের জানান দেয়। তাতে আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই ধরনের আন্দোলনের ফল প্রগতির অনুকূল ও প্রতিকূল দুই-ই হতে পারে। বস্তুত নেতৃত্বের চরিত্রের দ্বারাই আন্দোলনের চরিত্র নির্ধারিত হয়।

আমাদের দেশে গত অর্ধশতাব্দীকালে যেসব বড়ো-বড়ো গণ-আন্দোলন হয়েছে সেগুলো জনগণের জন্য যতটা মঙ্গলকর হতে পারত তা হয় নি। কার্যত প্রতিটি বড়ো আন্দোলনেরই নেতৃত্ব দখল করে নিয়েছে জনস্বার্থবিরোধী শক্তি। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে গত অর্ধশতাব্দীকালে যে দুটি রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ভাগ্যগড়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে নিজেদের পক্ষে জনগণের সবচেয়ে বেশি সমর্থন আদায় করতে এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়, সেই দুটি দলের দলীয় চরিত্র, এবং ক্ষমতাসীন থাকার সময় তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করলে এটা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়। ক্ষমতা দখলের স্বার্থে তারা সুপরিকল্পিতভাবে জনসাধারণের চেতনাকে জাগিয়েছে এবং আবেগ সৃষ্টি করেছে; তারপর জনসাধারণের সেই আবেগকে তারা কাজে লাগিয়েছে নিজেদের ক্ষমতা দখলের স্বার্থে। ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সুযোগ তারা গ্রহণ করেছে অত্যন্ত সতর্ক এবং সুপরিকল্পিতভাবে। জনসাধারণের জিজ্ঞাসা, যুক্তিবোধ আর বিচারপ্রবণতাকে তারা বিকশিত হতে দিতে চায় নি। দলীয় আর গোষ্ঠীগত স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা দখল পর্যন্ত তারা অগ্রসর হয়েছে বিচার-বিবেচনা করে; কিন্তু তাদের এই বিচার-বিবেচনার মর্মে নিজেদের দলীয় আর গোষ্ঠীগত স্বার্থচিন্তার বাইরে জনকল্যাণের স্থান ছিল অতি অল্প। জনস্বার্থ-বিরোধী উদ্দেশ্য নিয়েও ক্ষমতা দখল পর্যন্ত তারা বিচার-বিবেচনার পরিচয় দিয়েছে বলেই তাদের পক্ষে ক্ষমতা দখল সম্ভব হয়েছে। তাদের বিচার-বিবেচনায় অবশ্য বিবেকের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না; তাদের কর্মধারা পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অনেক সময় নিজেদের অন্তরের বিবেককে দলন করেই তারা নগ্নস্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে নিজেদের বিচারশক্তিকে কাজে লাগিয়েছে।

এ সমাজে বার-বার জনস্বার্থবিরোধী নেতৃত্বের আত্ম-প্রকাশের এবং জনপ্রিয়তা লাভের কারণ হল কার্যক্ষেত্রে আমাদের বিচার-বিবেচনার অভাব—আমাদের আবেগ-সর্বস্বতা, হুজুগপ্রিয়তা আর অপরিণামদর্শিতা। যে সতর্কতার সঙ্গে সমাজে, সংগঠনে আর রাষ্ট্রে ভালো নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য আমাদের মনোযোগী হওয়া উচিত তা আমরা হই না—গড্ডলপ্রবাহে ভেসে চলি। আমাদের এই আচরণের ফলে যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশে গড়ে ওঠে সেই নেতৃত্বই নিজেদের অবিমৃষ্যকারী কার্যকলাপের দ্বারা ক্রমাগত আমাদের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ায়, এবং বার-বার সামরিক শাসন জারিকে ও সামরিক শক্তির ক্ষমতায় থাকাকে অনিবার্য করে তোলে।

গণস্বার্থবিরোধী শক্তিগুলোর কথা বাদ দিয়ে আমরা যদি আমাদের নিজেদের সংগঠনসমূহের—অর্থাৎ যেসব

সংগঠনের আমরা সদস্য, যেসব সংগঠনকে আমরা কমবেশি সমর্থন করি, যেসব সংগঠনের ঘোষিত আদর্শ এবং কর্ম-সূচীকে আমরা কমবেশি সমর্থনযোগ্য আর অংশগ্রহণ-যোগ্য মনে করি, সেগুলোর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাই আমাদের নেতারা যেমন আবেগসর্বস্ব, অস্থিরচিত্ত, অদূরদর্শী, আমরা নিজেরাও তেমনি। ফলে আমাদের সংগ্রাম সফল হয় না, আত্মত্যাগ বৃথা যায়। আসলে আমাদের আচরণই প্রতিফলিত হয় আমাদের নেতাদের আচরণের মধ্য দিয়ে। অন্যদিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, আমাদের নেতাদের আচরণও প্রতিফলিত হয় আমাদের আচরণের মধ্য দিয়ে। এ অবস্থায় আমরা যদি বিবেকবান আর যুক্তিপরায়ণ হতে চেষ্টা করি এবং আমাদের নেতারাও যদি বিবেকবান আর যুক্তিপরায়ণ হতে চেষ্টা করেন আর আমাদেরকেও বিবেকবান আর যুক্তিপরায়ণ হয়ে উঠতে সাহায্য করেন, তাহলে হয়তো আমাদের পক্ষে বর্তমান পতনমুখী সামাজিক অবস্থা থেকে জাতীয়ভাবে মুক্তির আর প্রগতির উত্থানমুখী পথে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর হতে পারে। গণস্বার্থবিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে কেবল বৈষয়িক শক্তি আর জনবলই যথেষ্ট নয়, নৈতিক শক্তিও অপরিহার্য। জনগণের মুক্তি-সংগ্রামে বিবেক আর যুক্তির বাস্তবসম্মত অনুশীলনই যথার্থ নৈতিক শক্তির জন্ম দেয়, যথার্থ নৈতিক শক্তি সহায়ক হয় বৈষয়িক শক্তির সম্প্রসারণে এবং ক্রমবর্ধমান জনবল সংগঠনে। নৈতিক সচেতনতা আর নৈতিক অনুশীলন ত্যাগ করে "শ্রেণী-সংগ্রামে"র, "সর্বহারার একনায়কত্বে"র ও "গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে"র গতবাঁধা স্লোগান তুললে, কিংবা "শ্রেণীশত্রু খতমে" ও "direct action"-এ নিয়োজিত থাকলে, তাতে শোষিত-নির্যাতিত-মুক্তিকামী জনসাধারণের কোনো মঙ্গল হয় না।

যুক্তি শব্দটি আমরা প্রায় প্রতিদিন আমাদের কথা-বার্তায় ব্যবহার করি। যখন আমরা কোনো বক্তব্য প্রকাশ করি তখন মানুষকে আমরা বোঝাতে চেষ্টা করি যে আমাদের বক্তব্য যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অযৌক্তিক কোনো কিছুকে আমরা ভালো বলে স্বীকার করি না। যুক্তিকে আমরা মনে করি কল্যাণপ্রসূ; যৌক্তিক ব্যাপারকে মনে করি সাক্ষাৎ কল্যাণ আর অযৌক্তিক ব্যাপারকে সাক্ষাৎ অকল্যাণ। তা সত্ত্বেও এমন উক্তি কেন আমাদের করতে হয় যে রাষ্ট্রীয় জীবনে আমাদের কার্যকলাপ

অযৌক্তিক?

আসল প্রশ্ন হল, যে যুক্তিকে আমরা এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করি, তার স্বরূপ আর প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে বুঝবার কোন চেষ্টা কি আমরা করি? অনুসন্ধান না করেই আমরা ধরে নিই যে ব্যাপারটিকে আমরা বুঝি; সেজন্য এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমরা অগ্রসর হই না। কিন্তু ব্যাপারটিকে আসলেই কি আমরা যথেষ্ট পরিমাণে বুঝি? আমার মনে হয়, অনুসন্ধান ছাড়া, বিচার-বিবেচনা ছাড়া এই যে আমরা ধরে নিই যে যুক্তি ব্যাপারটিকে আমরা বুঝি, এই ঘটনাই আমাদেরকে ঠেলে দেয় সম্পূর্ণ অযৌক্তিক পথে। অনুসন্ধান, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং বিচার-বিবেচনা করে আমাদের বুঝতে চেষ্টা করা দরকার, যুক্তি কী?

বিজ্ঞান-মতে, জড় বস্তুর শত-শত কোটি বৎসরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাণীর উদ্ভব। প্রাণী-মাত্রই চেতনার অধিকারী। চেতনা হল অত্যুন্নত বস্তুর আপন সত্তায় বাহ্যজগৎকে এবং অন্তর্জগৎকে অনুভব করবার এবং কোনো কিছুর স্পর্শে বা প্রভাবে সাড়া দেওয়ার শক্তি। বস্তুবহির্ভূত, নিরবলম্ব কোনো চেতনার সন্ধান পাওয়া যায় না। মানুষ সবচেয়ে উন্নত প্রাণী, এবং মানুষের চেতনাও অন্য যে-কোনো প্রাণীর চেতনার চেয়ে উন্নত, উৎকর্ষমণ্ডিত। মানুষের চেতনায় শুধু অনুভবশক্তি নয়, প্রখর বিচারশক্তিও আছে। মানুষ সুন্দর-কুৎসিত, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, ভুল-শুদ্ধ, কর্তব্য-অকর্তব্য বিচার করার এবং আবিষ্কার-উদ্ভাবনের শক্তির অধিকারী। অন্যান্য প্রাণীরও বিচারশক্তি আছে, কিন্তু মানুষের তুলনায় তা নগণ্য। তা ছাড়া, মানুষের চেতনায় আরও একটি সত্তার সন্ধান পাওয়া যায় যাকে বলা হয় বিবেক। বিবেক মানুষকে তাড়িত করে অন্যায়, অকল্যাণ, অপ্রেম আর কুৎসিতের পথ পরিহার করে ন্যায়, কল্যাণ, প্রেম আর সুন্দরের পথে চলতে।

মানুষের এই বিচারশক্তির আর বিবেকের উৎস, ক্রিয়াপ্রণালী এবং বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলেই যুক্তির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়।

বাইরের জগৎ ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের মস্তিষ্কে ক্রিয়া করে, তার ফলে মানুষের চেতনা জেগে ওঠে। এই জেগে-ওঠা চেতনায় বৈষের প্রকাশ ঘটে: পরস্পরবিরোধী প্রবণতার সহাবস্থান আর সংগ্রাম দেখা দেয়। কোনো-কোনো পরিস্থিতিতে মানুষের মনে যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের

সৃষ্টি হয়, শেকসপীয়রের নাটকে কিংবা বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-তলস্তয়-হুগো-ডিকেন্সের উপন্যাসে নরনারীর অন্তর্দ্বন্দ্বের যে ঘনীভূত প্রতিফলন দেখা যায়, তা এই দ্বৈধেরই প্রকাশ। সুন্দর-কুৎসিত, ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গল-অমঙ্গল, কর্তব্য-অকর্তব্য, ফলাফল ইত্যাদি বিচার করার প্রবণতাও মানবচৈতন্যের এমনি দ্বৈধের প্রকাশ। প্রতিদিনের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নানাভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তার চেতনায় এই দ্বৈধের অস্তিত্ব অনুভব করে।

বাস্তবের স্পর্শে আপন সত্তায় জাগ্রত প্রবৃত্তি, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, কামনা, ক্ষোভ, ক্রোধ, লোভ, ভয় ইত্যাদি দ্বারা তাড়িত হয়ে যখন মানুষ কোনো কর্মে ধাবিত হয়, তখন সেই কর্মের ঔচিত্য-অনৌচিত্য, শুভাশুভ এবং ফলাফল সম্পর্কে, এবং উদ্দেশ্যসাধনের প্রকৃষ্ট পন্থা সম্পর্কে তার মনে প্রশ্ন জাগে। প্রশ্নের পর উত্তর, উত্তরের পর আবার প্রশ্ন, আবার উত্তর···এই ধারায় চলতে-চলতে এক সময়ে মীমাংসা। এই ধরনের প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্ন এবং উত্তর-প্রত্যুত্তরই হল যুক্তি। পর্যবেক্ষণ করতে গেলে দেখা যায়, যুক্তি নিতান্ত তাৎক্ষণিক ব্যাপার নয়—দীর্ঘ প্রক্রিয়া।

যুক্তি আবেগের নিয়ন্ত্রক বা পরিচালক হিসেবে কাজ করতে চায়, আর আবেগ চায় যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে পরিণাম বিচার না করে আপাতস্বার্থের জন্য বেপরোয়া গতিতে এগিয়ে যেতে। ফলে মানুষের মনে আবেগ আর যুক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বে আবেগ স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠলে পরিণাম একরকম হয়, আর আবেগ যুক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত তথা পরিচালিত হলে পরিণাম অন্যরকম হয়।

যুক্তি মানুষকে চালিত করে প্রথমে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলতে আর তর্ক করতে। বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় নিজের সঙ্গে নিজে তর্ক-বিতর্ক করে ন্যায়, সুন্দর, শ্রেয় বা কর্তব্য নির্ধারণের কিংবা কোনো ব্যাপারে মীমাংসায় পৌঁছনোর প্রচেষ্টা হল যুক্তিপ্রয়োগের প্রথম পর্যায়। এই পর্যায় যথাযথ অতিক্রম করার পর অন্যের মতামত সন্ধান করতে হয়, এবং অন্যের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করে নিজের মতামতের শুদ্ধতা বিচার করতে হয়। সেইসঙ্গে ইতিহাসের আলোকে—মানবজাতির অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, নিজের মতামত বিবেচনা করতে হয়। বিচারবিবেচনার সময় সবকিছুরই প্রকাশকপকে ভেদ করে মর্ম সন্ধান করতে হয়। এভাবে যত দূর সম্ভব বর্তমান অবস্থা, অতীত পটভূমি আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা—সকল দিক বিবেচনায় ধরে এবং সকল পক্ষের মতামত বিচার করে মীমাংসায় বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়। তারপর সেই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে উদ্দেশ্য সাধনের বাস্তব কর্মে অগ্রসর হতে হয়। বাস্তব কর্মের এই পর্যায় হল যৌক্তিক অনুশীলনের পর্যায়। এই পর্যায়ে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা কর্মের দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করে। কর্মে অগ্রসর হয়ে পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে অন্ধভাবে বা অপরিবর্তনীয়রূপে ধরে থাকা যায় না, অনুশীলনের ধারায় পূর্ববর্তী মীমাংসায় কমবেশি অপূর্ণতা কিংবা ত্রুটি ধরা পড়ে। তখন সিদ্ধান্তের পরিমার্জন কিংবা সংশোধন করে কর্ম সম্পাদন করতে হয়। এভাবে যুক্তি-প্রয়োগের এক-একটি প্রক্রিয়া প্রথম পর্যায় থেকে শেষ পর্যায়ে পৌঁছনোর আঁকাবাঁকা উঁচুনীচু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে।

যুক্তিপ্রয়োগের অপরিহার্য ধাপগুলোর যে-কোনোটিকে অবহেলা করে এগিয়ে গেলে মীমাংসা ভুল হয়, এবং ভুল মীমাংসা অবলম্বন করে অনুশীলনে অগ্রসর হলে কর্মে বিপত্তি ঘটে, অভীষ্ট ব্যর্থ হয়। তবে সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে কাজ করা মানুষের পক্ষে অনেক সময়ই সম্ভবপর হয় না।

যুক্তিপ্রয়োগের উদ্দেশ্য কোনো অন্ধবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করা কিংবা অন্যকে পরাজিত করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা নয়; যুক্তিপ্রয়োগের উদ্দেশ্য হল : বিশেষ-বিশেষ অবস্থায় ন্যায়, সুন্দর, শুভ আর কর্তব্য নির্ধারণ করা, প্রকৃষ্ট সাধনপদ্ধতি উদ্ভাবন করা এবং কর্তব্য সাধন করা। মানুষের জেগে-ওঠা চেতনায় "বিবেক"-নামক যে প্রবণতা প্রকাশ পায়, তাই মানুষকে চালিত করে ন্যায়, সুন্দর, শুভ আর কর্তব্যের পথে। "বিবেক" যুক্তিপ্রয়োগের প্রক্রিয়ায় দিক-নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। সামাজিক, সাংগঠনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডে ক্রিয়াশীল থাকে সংশ্লিষ্ট জনসমষ্টির "যৌথ বিবেক"।

নানা কারণে মানুষের "বিবেক" বিকারপ্রাপ্ত কিংবা দুর্বল হতে পারে। "বিবেক" বিকারপ্রাপ্ত বা দুর্বল হলে যুক্তিপ্রবণতা দিকভ্রষ্ট বিপথগামী হয়। সে-অবস্থায় মানুষ কুযুক্তি আর কুতর্ক অবলম্বন করে, কিংবা অবিমৃষ্যকারিতা, অদূরদর্শিতা আর ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেয়—জীবনের স্বাভাবিকতা আর সুস্থতা হারিয়ে ফেলে। কোনো-কোনো সময় এক-একটি গোটা সমাজের বিবেককে দুর্বল হয়ে পড়তে কিংবা বিকারপ্রাপ্ত হতে এবং যুক্তিপ্রবণতাকে দিক-ভ্রষ্ট আর বিপথগামী হতে দেখা যায়। তবে কালক্রমে

আবার দুর্বল, বিকারপ্রাপ্ত, বিপথগামী বিবেক সুস্থ আর শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

মানুষ যেমন লক্ষ-লক্ষ বৎসরের সাধনা আর সংগ্রামে আজকের অবস্থায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তেমনি মানুষের বিবেক আর যুক্তিবোধও লক্ষ-লক্ষ বৎসরের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের অবস্থা লাভ করেছে। মানুষের বিকাশের সম্ভাবনা অফুরন্ত। বিবর্তনবাদ অনুযায়ী : "শেষ অবধি ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা নই, সব প্রতিকূলতাকে ঠেলে, সব অধঃপতন সত্ত্বেও 'মানবযাত্রী' এগিয়ে চলেছে মঙ্গলের দিকে, সুন্দরের দিকে, ধীরমন্থর গতিতে···।"

বিবেককে সুস্থ, সবল, সমৃদ্ধ আর সক্রিয় রাখার জন্য এবং যুক্তিপরায়ণতা বজায় রাখার জন্য সজ্ঞান, সতর্ক, কষ্টসাধ্য অনুশীলন দরকার। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তেমনি যৌথ জীবনে—পারিবারিক, গোষ্ঠীগত,-জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে দরকার বিবেক আর যুক্তির এই অনুশীলন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, দলীয়, সাংগঠনিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে দরকার বিবেক আর যুক্তির এই অনুশীলন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার বিবেক আর যুক্তির এই অনুশীলন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার বিবেক আর যুক্তির এই অনুশীলন। সভ্যতা আর সংস্কৃতির অগ্রগতি সাধনের জন্য দরকার বিবেক আর যুক্তির এই অনুশীলন। সামরিক শাসন আর রাজনৈতিক স্বৈরাচার দূর করার জন্য দরকার বিবেক আর যুক্তির এই অনুশীলন। সুস্থ, সবল, সক্রিয় সমৃদ্ধ আনন্দময় মানসিক জীবনের জন্য দরকার বিবেক আর যুক্তির এই অনুশীলন। বলিষ্ঠ, সমৃদ্ধ, নিরাপদ বৈষয়িক জীবনের জন্য দরকার বিবেক আর যুক্তির এই অনুশীলন। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করে উন্নততর নতুন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দরকার বিবেক আর যুক্তির এই অনুশীলন। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি এবং গোটা মানবজাতির সত্তাবা সর্বমাত্রিক প্রস্ফুটন, সমৃদ্ধি আর পূর্ণতার জন্য ব্যক্তিগত এবং যৌথ, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সর্বপ্রকার কর্ম-কাণ্ডের মধ্যে দরকার বিবেক আর যুক্তির সজ্ঞান, সতর্ক, কষ্টসাধ্য অনন্ত অনুশীলন। সকল প্রকার শারীরিক আর মানসিক শ্রমে, আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক কর্মকাণ্ডে স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, ক্রত্রিমতা নয়, অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার নয়, দরকার বিবেক আর যুক্তির যথাযথ অনুশীলন। যুগ-যুগ ধরে মানুষ যে অলীক স্বর্গসুখের কল্পনা করে এসেছে, সকল প্রকার মানবীয় কর্মকাণ্ডে যুক্তি আর বিবেকের অনুশীলন দ্বারা মানুষ পৃথিবীতে সেই সুখ সম্ভব করতে পারে।

বিবেক আর যুক্তির অনুশীলন মানুষের মধ্যে যে শক্তির জন্ম দেয় সেই শক্তির বলেই মানুষ প্রভু হয়ে উঠতে পারে—অবস্থার প্রভু, প্রবৃত্তির প্রভু। আর এই শক্তি যখন মানুষ হারিয়ে ফেলে, যখন মানুষের বিবেক বিকার-প্রাপ্ত এবং যুক্তিবোধ বিপথগামী হয়, তখনই মানুষ দাসে পরিণত হয়—অবস্থার দাস, প্রবৃত্তির দাস।

যখন কোনো সমাজের নেতৃত্বকারী শক্তিসমূহের বিবেক বিকারপ্রাপ্ত হয় এবং যুক্তিবোধ বিপথগামী হয়, তখন সেই সমাজে অন্ধকার যুগের লক্ষণাদি ফুটে ওঠে। অপর দিকে, ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় যখন ওই সমাজে নেতৃত্বকারী শক্তি-সমূহের মধ্যে বিবেক আর যুক্তিবোধের প্রাধান্য দেখা যায়, তখন সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক কর্মকাণ্ডে জাগরণের আর সমৃদ্ধির লক্ষণ ফুটে ওঠে।

সমাজের নেতৃত্ব সৃষ্টিতে জনগণেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। যে জনগণ যখন যেমন নেতৃত্বের যোগ্য হয়, সেই জনগণ নিজেদের মধ্যে থেকে তখন ঠিক সেইরকম নেতৃত্বই তৈরি করে। নেতৃত্বের দোষগুণের মধ্যে জনসাধারণের দোষ-গুণেরও প্রতিফলন থাকে। আবার জনসাধারণের মানসিকতা সৃষ্টিতে এবং আচরণ নিয়ন্ত্রণে নেতাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। নেতাদের যোগ্যতা এবং নৈতিক মান অনুযায়ী জনসাধারণের সামাজিক মানসিকতা আর আচরণ বৈশিষ্ট্য-লাভ করে। সামাজিক আচরণে জন-সাধারণের দোষগুণের মধ্যে নেতাদের দোষগুণেরও প্রতি-ফলন থাকে। "মহান জাতি মহান নেতা সৃষ্টি করে"—এ কথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য "মহান নেতা মহান জাতি সৃষ্টি করেন"।

কিছুটা ভুলের ঝুঁকি নিয়েও বলা যায়, বাঙলাভাষী অঞ্চলে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর মাৎস্যন্যায়, ত্রয়োদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক-রাষ্ট্রিক বিপর্যয় অন্ধকার যুগের পরিচয়বাহী; আর শ্রীচৈতন্যসৃষ্ট কাল এবং রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের কাল জাগরণের পরিচয়বাহী। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির ঐতিহাসিক প্রবণতাসমূহ লক্ষ করে বলা যায় : গত কয়েক দশক ধরে সমাজ এক অন্ধকার যুগের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে; বিবেক আর যুক্তির অনুশীলনের ভিত্তিতে যদি কোনো সংগ্রামী সংঘশক্তি সমাজের নিম্নস্তর থেকে আত্ম-প্রকাশ করে, তাহলে সেই শক্তির পক্ষে সম্ভবপর হতে পারে গৌরবময় জাগরণের নতুন যুগ সৃষ্টি করা, এবং উন্নততর নতুন আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

[রচনা : ১৯৮৫ ; পরিমার্জন ও পরিবর্ধন : জুলাই ১৯৮৬।]

নূতন দৃষ্টিতে ইতিহাস-বিচার ?

Ancient Indian History in a New Light. By Abdul Halim. Srijani, Dhaka. 1978.

Introducing a New Theory of History. By Abdul Halim. Subarna Prakashani, Dhaka, 1985.

এ দুই পুস্তিকাতে লেখক ইতিহাসের এক "নূতন তত্ত্ব" প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। প্রথমটাতে এর খানিকটা পরিচয় মেলে। বিশদ ব্যাখ্যা আছে দ্বিতীয় পুস্তিকায়। এই তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা আছে প্রথমটায়—প্রধানত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে।

এই প্রয়োগের যাথার্থ্য বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। লেখকের যুক্তিবিন্যাস সংগতিপূর্ণ কিনা, তাই আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

লেখকের মূল সিদ্ধান্ত :— আঞ্চলিক সভ্যতায় স্বাতন্ত্র্যের উপাদান আছে। বিশ্ব-ইতিহাস কিন্তু মূলত এক এবং অভিন্ন। সমগ্রতাই তার আসল রূপ। কোনো অঞ্চলের ইতিহাসকে বিশ্বসভ্যতার মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার প্রকৃত রূপ ধরা পড়ে না। জীববিজ্ঞান থেকে একটা উদাহরণ নিয়ে লেখক বিশ্বসভ্যতার অখণ্ড গাতময়তা বোঝাতে চেয়েছেন। যে-কোনো জৈব অস্তিত্ব লক্ষকোটি প্রাণময় কোষের সমন্বিত এক প্রক্রিয়ামাত্র। অথচ প্রত্যেকটা কোষের ভিন্ন অস্তিত্ব।

আঞ্চলিক সভ্যতাগুলি বিশ্বসভ্যতার মূল গতিবেগের সঙ্গে কিভাবে সম্পৃক্ত ? এ সংযোগ নির্বিঘ্নতন হয়, যখন সভ্যতার (socio-economic formation) এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণ ঘটে। একই স্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন সভ্যতা পরস্পরকে প্রভাবিত করে; কিন্তু শুধুমাত্র এর থেকে কদাচিৎ নূতন সভ্যতার উন্মেষ সম্ভব হয়। এ রূপান্তর ঘটে উন্নততর কোনো সংস্কৃতির সংস্পর্শের ফলে।

অথচ যে জটিল প্রক্রিয়ায় এ নূতন সভ্যতার উদ্ভব হয়, তা বিশেষ কোনো

গ্রন্থসমালোচনা

অঞ্চলেই (focal point) সীমাবদ্ধ থাকে। এর কারণ, আনুষঙ্গিক উপকরণের অস্তিত্বই এ রূপান্তরের জন্য যথেষ্ট নয়। এ রূপান্তর নির্ভর করে তাদের সামগ্রিক বিন্যাসের বিশিষ্ট রূপের উপরই। তা ছাড়া প্রয়োজন এক সুসংহত ভাবাদর্শের (idcology), যা না হলে কোনো সমাজব্যবস্থাই দীর্ঘদিন টিকতে পারে না।

এ কেন্দ্রে (focal point) থেকেই নূতন সভ্যতার প্রভাব নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে অন্যান্য সভ্যতায় গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তনের মৌলিক কতগুলি সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু আঞ্চলিক সভ্যতার বিকাশ উন্নততর সভ্যতার অবিকল অনুকরণ মোটেই নয়। তার আগেকার বৈশিষ্ট্যের জন্যই তার স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হয় না।

সভ্যতার ব্যাপ্তি এবং প্রসার সম্পর্কে লেখকের বিশ্লেষণ 'ডিফ্যুশনিজম' (Diffusionism) নামক মতবাদ বলে মনে হতে পারে। লেখকের দাবি, তাঁর ব্যাখ্যা ভিন্ন। ডিফ্যুশনিজমের প্রবক্তারা প্রধানত উৎপাদনের রীতি এবং কলাকৌশলের প্রসারের কথাই বলেন। সভ্যতা সম্পর্কে লেখকের ধারণা ব্যাপকতর। সামগ্রিক সমাজ-সংগঠন এবং সংস্কৃতিকেও তিনি সভ্যতার অপরিহার্য অঙ্গ মনে করেন।

লেখকের ধারণা, ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যা এবং তাঁর "নূতন তত্ত্বে"র মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। তবে তিনি মনে করেন, মার্কস ইতিহাসে পরিবর্তনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেন নি। মার্কসের বিশ্বাস, প্রচলিত উৎপাদনব্যবস্থায় নানা ধরনের স্ববিরোধ তীব্র হলেই নূতন ব্যবস্থার আবির্ভাব ঘটে। লেখক মনে করেন, শুধুমাত্র স্ব-বিরোধের তীব্রতাই এর জন্য যথেষ্ট নয়। বাইরের প্রভাবের ভূমিকা এক্ষেত্রে অপরিহার্য। তার উৎস, নানা রূপ কিন্তু উনি নির্দেশ করেন নি।

কোনো সভ্যতাই যে একান্ত স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন ভাবে গড়ে ওঠে না, এটা সব ঐতিহাসিক মানেন। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসকে এ বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিশ্লেষণের জন্য লেখকের প্রয়াস অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। তাঁর পাণ্ডিত্যও তর্কাতীত।

লেখকের বিশ্লেষণ থেকে কিন্তু কয়েকটা জটিল প্রশ্নের উত্তর মেলে না। কয়েকটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। উৎপাদনব্যবস্থায় এবং আনুষঙ্গিক সমাজসংগঠনে ক্রমবিকাশের কয়েকটা পর্যায় কিভাবে এসেছে, তা মোটামুটি স্বীকৃত। কিন্তু একটা পর্যায় থেকে অন্য একটা পর্যায়ে উত্তরণ কিভাবে ঘটে ?

বিভিন্ন উৎপাদনব্যবস্থার রূপান্তরের জটিল প্রক্রিয়া কি অভিন্ন ? এ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা না থাকার জন্য লেখকের যুক্তিবিন্যাসও শিথিল এবং অস্পষ্ট থেকে গেছে। প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহের জন্যই তাঁর ব্যাখ্যায় পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের সম্পর্ককে (ccology) বড়ো করে দেখানো হয়েছে। প্রাচীন প্রস্তরযুগ থেকে নবপ্রস্তর বিবর্তনে সম্পর্কে এ ব্যাখ্যা অনেকাংশে খাটে। কিন্তু পরবর্তী যুগের পরিবর্তনের প্রক্রিয়া অনেক বেশি জটিল। যেমন, সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণে 'ইকলজি'র ভূমিকা নগণ্য।

লেখকের আরো একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের যথার্থ ব্যাখ্যা নেই। উন্নততর সভ্যতার আবির্ভাব কেন একটা অঞ্চলেই ('focal point') ঘটবে ? অন্য কোথাও এ সংঘটনের পথে কী কী অন্তরায় ছিল ?

যে কয়েকটা দৃষ্টান্ত লেখক মাঝে-মাঝে দিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক প্রমাণসিদ্ধ কিনা, সন্দেহ থেকে যায়। দুটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বহু জায়গায় প্রচলিত ছিল। অথচ য়ুরোপেই প্রথম এ ব্যবস্থার অবসান ঘটে, এবং ধনতন্ত্রের উদ্ভব এবং প্রসার ঘটে। এর একটা মূল কারণ হিসেবে লেখক প্রাচীন রোমান সভ্যতার সঙ্গে নবাগত জার্মান উপজাতিদের সমাজ-ব্যবস্থা ও ধ্যান-ধারণার সংমিশ্রণের কথা উল্লেখ করেছেন। এর ফলেই য়ুরোপীয় সভ্যতায় এমন এক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যা অন্য অঞ্চলে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। এ ব্যাখ্যা নিয়ে য়ুরোপের জটিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব বোঝানো যাবে না।

তা ছাড়া, য়ুরোপকে অখণ্ড একক (unit) বলে নেওয়া যায় কি ? রোমান এবং জার্মান জাতির সংমিশ্রণ য়ুরোপের কত জায়গায় তো ঘটেছে—অথচ নূতন ব্যবস্থার প্রথম আবির্ভাব ঘটল ইংল্যান্ডে। অন্যান্য জায়গায় এ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে অনেক পরে। তার পটভূমিকাও ভিন্ন।

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে লেখকের সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিকের কাছে সম্ভবত গ্রহণীয় হবে না। তাঁর ধারণা, নানা কারণে রাশিয়ায় প্রাচীন স্লাভিক সভ্যতা এবং ঐতিহ্যপ্রসূত গণতান্ত্রিক মানসিকতা অব্যাহত ছিল বলেই রুশ সমাজ এক বিশিষ্ট ভাবে বিকাশলাভ করতে পেরেছিল। রুশবিপ্লবের ঐতিহাসিকের কাছে এ ব্যাখ্যা অতি সরল মনে হবে।

উন্নততর সভ্যতার প্রভাব মূলকেন্দ্র থেকে কিভাবে বিকীর্ণ হতে থাকে, সে সম্পর্কেও লেখকের বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। ঐতিহাসিকের কাছে একটা প্রধান প্রশ্ন, কিভাবে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা বাইরের প্রভাবকে আত্মসাৎ করে। এ প্রভাব অন্য জায়গায় বিকাশকে ত্বরান্বিত না-ও করতে পারে। এমনকি তাকে ব্যাহত করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে বাইরের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব অন্য অঞ্চল থেকে অনেক ভিন্ন। উপনিবেশের নূতন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠন তার প্রাক্তন বিকাশের ধারাকে অবরুদ্ধ করে শুধু নয়—তাকে বিকৃতও করে।

এক মূলকেন্দ্র থেকে সভ্যতার (socio-economic formation) প্রভাব ছড়িয়ে পড়ার দৃষ্টান্ত হিসেবে লেখক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। তাঁর ধারণা, ভারতীয় উপমহাদেশেই এ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়—এবং এখান থেকে এটা অন্য জায়গায় বিস্তৃত হয়। এ সিদ্ধান্ত চমকপ্রদ—কিন্তু এর ঐতিহাসিক ভিত্তি কী ? তা ছাড়া, ধনতন্ত্রের আদল অনুকরণ করা যায়। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যন্ত্রশক্তির প্রয়োগ একটা উল্লেখযোগ্য দিক। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের অনুকরণযোগ্য ছাঁচ কী ? উৎপাদনের রীতি এবং কলাকৌশলের মধ্যে একে খুঁজে পাওয়া যাবে না। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য—রাজনৈতিক সংগঠন আর সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের মাধ্যমে কৃষকের উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করা। এ উপায় নানা দেশে নানারকম হতে পারে। ভারতবর্ষ থেকে সামন্ততান্ত্রিক প্রথার প্রসারের কথা ছেড়েই দিলুম। মোটামুটিভাবে এ ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায়, তা ভারতবর্ষে মোটেই কোনদিন ছিল কিনা, ঐতিহাসিকরা সন্দেহ করতে শুরু করেছেন।

বিনয় চৌধুরী

ভ্রান্তিবিলাস

ইদানীং ইংরাজি তথা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ে সংশয়প্রকাশ, এবং কবিতাবিশেষ থেকে তাঁর উদ্ধৃতির নানা ভুল ধরা একটা রেওয়াজে পরিণত হচ্ছে। ভ্রম যে তিনি কোথাও কখনও করেন নি, একথা অবশ্যই বলা যায় না। তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে Donne-এর বিখ্যাত কবিতা 'The Canonization' থেকে উদ্ধৃতিই নির্ভুল নয়। ওই গ্রন্থে আরো দু-একটি ইংরাজি কবিতা থেকে উদ্ধৃতিতেও খুঁত আছে।

কিন্তু এই প্রবন্ধের বক্তব্য এই যে—

(১) এ-জাতীয় ভুল অমার্জনীয় তো নয়ই, অপ্রত্যাশিতও নয়।

(২) এইসব ভ্রম সংকলন এবং সংশোধনের থেকে উদ্ধৃতিগুলির উৎস অনুসন্ধান আরও সার্থক উদ্যম।

(৩) উৎস আবিষ্কারের পর স্বভাবতই ঔৎসুক্য জাগে "শেষের কবিতা"র নায়ক অমিত রায় প্রেমের কবিতার বাছা-বাছা উদাহরণ কেন Oxford Book of English Mystical Verse থেকে সংগ্রহ করলেন জানতে। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রয়াস আছে গীতিকাব্যে প্রেম আর ভক্তি—এই দুই পর্যায়ের সমন্বয়সাধন রবীন্দ্রমানসে কিভাবে প্রতিভাত তারই বিশ্লেষণে।

প্রতিযুগেই কবিবন্দনার অনুগামী হয় কবিনিন্দা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরাজি কতটা জানতেন, কোথায়-কোথায় বিদেশী সাহিত্যের কাছে ঋণ তিনি চেপে গেয়েছেন, তাঁর ইংরাজি লেখার কতটা তাঁর নিজস্ব, কোথায় বা স্মৃতি তাঁকে প্রতারণা করেছে—এইসবেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা সম্প্রতি রবীন্দ্র-সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এর উদ্দেশ্য মনে হতে পারে সৎ—তথ্যগত অভ্রান্তি প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আসলে এই দুরারোগ্য প্রবণতা হয়তো বিশ্বকবির ফাঁপিয়ে-

প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ

তোলা মাহাত্ম্যকে কেটেছেঁটে মাপসই করে আনা—'cutting him down to size'!

একটু নজর করলেই দেখা যাবে, এ-জাতীয় ঝুড়ি-ঝুড়ি নজির সংগ্রহ খুব দুরূহ নয়। "শেষের কবিতা"র কথাই ধরা যাক। বইটি আজ পর্যন্ত এই অত্যুৎসাহীদের শ্যেনদৃষ্টি কেন এড়িয়ে গেছে তা জানি না। অমিত রায় অক্‌স্‌ফোর্ডে ছিল ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্র। তার মুখে অনেকগুলি 'quotes' আছে যার বেশ কয়েকটিই 'mis-quotes'। 'চমকে উঠলে যখন দেখতে পেলে ইংরেজ কবি ডন্‌-এর কাব্য-সংগ্রহ। অক্‌স্‌ফোর্ডে থাকতে ডন্‌ ও তাঁর সময়কার কবিদের গীতিকাব্য ছিল অমিতর প্রধান আলোচ্য' (৫—আলাপের আরম্ভ)। লাবণ্যের বা রবীন্দ্রনাথের এই সংগ্রহটি যদি Grierson-এর না হয়ে অন্য কারো (যেমন Grosart and Chambers) সংগ্রহও হয়, তবু একটি অতিরিক্ত (apostrophe) 's' সমেত 'For God's sake hold your tongue'[1] "শেষের কবিতা"র সংস্করণের পর সংস্করণে অক্ষয় হয়ে আছে কী করে? তাও এক অধ্যায়ে নয়, পর-পর দুই অধ্যায়ে (৬—নূতন পরিচয় এবং ৭—ঘটকালি), যদিও 'ডন্‌ ও তাঁর সময়কার কবি' Grierson-কৃত নব-মূল্যায়নের সঙ্গে পরিচিতির অনুমানকে পুষ্ট করে। আবার দেখি, 'O what is this?'—এখানে প্রশ্নবোধক চিহ্নটি থাকবে না, থাকবে পুরো উদ্ধৃতির শেষে, রবীন্দ্রনাথে যেখানে আছে ফুলস্টপ। তৃতীয় উদাহরণ 'যে শুভখনে মম। আসিবে প্রিয়তম—ডাকিবে নাম ধরে অকারণ'। এই অনুবাদটির মূলে একটি 'that' আছে যেটি উদ্ধৃতিতে অন্তর্হিত অর্থাৎ 'In the hour my love cometh' নিখুঁত উদ্ধৃতি নয়। এটি হবে 'In the hour that my love cometh'।

এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই—নিজের ইংরাজি বিদ্যা সম্পর্কে যিনি 'কোবলো জবাব' দিয়েই রেখেছেন, তাঁর কমা-ফুলস্টপের ভ্রান্তির লেবু কচলে তেঁতো করে আমাদের সাধারণ পাঠকদের কী লাভ? সাহিত্যরসিককেই বা এই ধরনের সমালোচনা কোন্‌ কানাগলিতে এনে হাজির করে? এর দ্বারা বড়ো জোর প্রমাণ হয়, রবীন্দ্রনাথ আর-পাঁচজনের মতোই উদ্ধৃতি বিষয়ে ঢিলেঢালা ছিলেন, এখনকার কিছু লেখকের মতো অত 'home-work'-এর ধার তিনি ধারতেন না। তা ছাড়া এগুলি লেখকের প্রমাদ, না মুদ্রাকরপ্রমাদ—তার শেষ জবাব দেবে কে? সবই তো অনুমান।

১ মূলে আছে For Godsake

আর অনুমানের পথেই যদি হাঁটতে হয়, তবে তার উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি পরিবর্তন কি আমাদের পক্ষে আরও ফলপ্রসূ হবে না? সপ্তদশ শতকে মিলটনীয় মহাকাব্যের ধারার ব্যতিক্রম হিসাবে গীতিকবি এবং প্রেমের কবি ডন আর তাঁর অনুগামীরা ইংরাজি সাহিত্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিংশ শতকের প্রথম থেকে দ্বিতীয় দশকে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই তা জানতেন। কিন্তু তিনি নিজে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন অন্য কারণে। ঊনবিংশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে যখন হেম-মধু-নবীনের মহাকাব্যের জোয়ার ডেকেছে তখন গীতিকবি এবং প্রেমের গীতিকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন ব্যতিক্রম। কাব্যের বিচিত্র রূপরীতি নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করলেও মহাকাব্য তাঁকে আকর্ষণ করতে পারে নি। একাধিক প্রবন্ধ ছাড়াও "ক্ষণিকা"র 'ক্ষতিপূরণ' কবিতাটি এই মতের সমর্থক:

আমি নাবব মহাকাব্য / সংরচনে / ছিল মনে—/ ঠেকল কখন তোমার কাঁকন-/ কিঙ্কিণীতে / কল্পনাটি গেল ফাটি / হাজার গীতে। / মহাকাব্য সেই অভাব্য / দুর্ঘটনায় / পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে / কণায় কণায়।

প্রণয়গীতির তুচ্ছ কথা দিয়ে প্রিয়ার আঁখিসুধায় তাৎক্ষণিক অমরত্বপ্রয়াসী কবিকে এককালে অপাঙ্‌ক্তেয় থাকতে হয়েছিল।

আরো কৌতূহলী করে "শেষের কবিতা"র উদ্ধৃতিগুলির নির্বাচন। এক ডন-এরটি বাদে একটিও লৌকিক প্রেমের কবিতা নয়। 'কাল রাত্তির আড়াইটা পর্যন্ত…অক্‌স্‌ফোর্ড বুক অফ্‌ ভর্সেস-এর এ-পাত ও-পাত উলটেছি। ভালোবাসার কবিতা খুঁজেই পেলুম না, আগে সেগুলো পায়ে পায়ে ঠেকত'। 'কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নিপরীক্ষায়, সে আগুন অন্তরের'। 'পুরানো সব পড়া হু হু শব্দে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কত অল্পই টিকল' (৭—ঘটকালি)। বহু মুখর কবিকে 'চুপ' করিয়ে যে কটি কবি টিকেছেন ডন আর হুইটম্যানকে বাদ দিলে তাঁরা নন 'বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়বাজারের ছাপ মারা'। আরথার সাইমনসকে সাহিত্যে সাংকেতিকতার ধারার ব্যাখ্যাতা (The Symbolist Movement in Literature, 1899 গ্রন্থের রচয়িতা) হিসাবে বাঙলা সাহিত্যের পাঠক আমরা যতটা জানি, কবি হিসাবে ততটা নয়। আর ক্যাথরিন টাইনান হিংকসন-নাম্নী আইরিশ মহিলার কবিতা তো আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মনে আছে, "কড়ি ও কোমলে"র অধুনাবর্জিত 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' নামক অংশটিতে ক্রিসটিনা রসেটি আর এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং-এর কবিতার অনুবাদ আছে দেখে এবং 'মহিলা কবি'র সূত্র স্মরণে এঁদের রচনায় খুঁজেছি, কিন্তু কবিতাংশটির হদিস সেখানে মেলে নি।

কিন্তু যে কথা বলছিলাম—ভালোবাসার কবিতা হিসাবে যেগুলি 'অগ্নিপরীক্ষা'য় উত্তীর্ণ সেগুলি মিসটিক প্রেমের, অর্থাৎ মূলত ভগবৎপ্রেমের, কেন? অমিতর জবানিতেই কি উত্তর মিলবে? 'শিমুলকাঠই হোক আর বকুলকাঠই হোক, যখন জলে তখন আগুনের চেহারা একই' (মিলনতত্ত্ব)। শুধু মেয়ের মুখের কথায় আর পুরুষের মুখের কথায় প্রেমের রূপ এক নয়, লৌকিক প্রেম আর ভগবৎপ্রেম যখন নিখাদ হয় তখন তার চেহারাটাও এক। "সোনার তরী"র 'বৈষ্ণব কবিতা'য় যিনি লিখেছিলেন,

এই প্রেমগীতিহার / গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়, / কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।

তাঁর কাছে একথা নিশ্চয় সত্য। রবীন্দ্রনাথের ভগবৎপ্রেমের কবিতাগুলির লৌকিক এবং পারমার্থিক লোকে প্রয়োগের উভচারিতা (ambiguity) লক্ষ করে "ডায়েরির ছেঁড়া পাতা"য় ফাদার দ্যতিয়েন মন্তব্য করেছেন, খ্রীষ্টীয় ভগবৎপ্রেমের কবিতার ভাষায় লৌকিক প্রেমের ঠাট থাকতে পারে, প্রেমিককে মানুষ বলে ভুল হবার জো নেই। তা ছাড়া কবিতাগুলির লৌকিক ক্ষেত্রে যথেচ্ছ প্রয়োগ খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ে অকল্পনীয়। সুফি মরমিদের মাশুক আশিকের কবিতাগুলির অনুরূপ প্রয়োগে ইসলামি সম্প্রদায়ের আপত্তি আছে কিনা জানা নেই। এদিকে রবীন্দ্রনাথের যে পরান-সখা অভিসারে বেরিয়েছেন তিনি মানুষ প্রেমিক বা ঈশ্বর, দুইই হতে পারেন। গোঁড়া বৈষ্ণব যাই বলুন না কেন, উলটো দিক থেকে 'অসতী-ব্রজ্যা'র 'যঃ কৌমারহরঃ' এই লৌকিক প্রেমের কবিতাটিকে আধ্যাত্মিক অর্থে আত্মসাৎ করে এর ঐতিহ্য স্বয়ং চৈতন্যদেব প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

সাধারণ ধারণায় mystical বা মরমি কবিতা ধর্মীয় অর্থাৎ ভজন-বা সাধনগীতির অন্তর্ভুক্ত। সে নিজেই

কিন্তু একটি স্বতন্ত্র পর্যায়, আবার ভকতিপীরিতির সমন্বয়ীও বটে। মরমি কবিতা—যেখানে ধরম মরমে পরিণত—হয়তো প্লেটোর 'Symposium'-এ Diotima-ব্যাখ্যাত সেই spirit বা demon (GK daimon) যার আনাগোনা সতত দুই বিপরীত লোকের (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়) মধ্যবর্তিনী হয়ে। কাব্যলোকে সে ছায়ারূপিণী। বলা বাহুল্য, এই ছায়া (shadow : তুলনীয় Latin umbra=যুগপৎ 'shadow' এবং 'image') কায়ার বিপরীত নয়, বরং কায়াসঙ্গিনী বা কায়ার মানসলোকে উত্তরণের বাহক। কবিকৃত এই ছায়াযান অবিরত দুই বিপরীত জগৎ—মরলোক এবং অমরলোকের সমন্বয় সাধন করে চলেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মেটাফিজিক্যাল কাব্যেওএই 'স্পিরিট'-এর আনাগোনা যা একই সঙ্গে দেহী (corporeal) এবং বিদেহী (incorporeal), অনির্দেশ্য (indeterminate) এবং মধ্যমা (intermediate)। "শেষের কবিতা"য় প্রচলিত অর্থে বিদেহী প্লেটোনিক প্রেমতত্ত্ব নিয়ে অনেক কথাই লেখা হয়েছে। এর অন্য অর্থটির জন্য 'ঝরনা, তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছ ধারা' কবিতাটির কথা স্মরণ করা যায়। ঝরনায় যে আয়না আছে তা গতিমান এবং গীতিময়। আলো আর ছায়ায় মিলে রচনা করে এই প্রতিবিম্বস্রোত। প্রতিচ্ছবির মায়াকায়ার (ইলিউশন) ফাঁদেই সত্য ধরা পড়ে। ঝরনার সসীম বুকে অসীম আকাশ চরাচর বিশ্ব প্রতিফলিত হতে বাধা পায় না। আবার যে আয়না নিয়ে আমরা ঘুরি, অর্থাৎ আমাদের চোখ, তা দিয়ে বাইরের বিশ্বের সবই দেখি : নিজেকে দেখতে পাই না, কাজেই ঝরনার আয়নাই আত্মদর্শনের একমাত্র উপায়। তাই লাবণ্যরূপিণী স্বচ্ছ ঝরনার আয়নায় কবি আর প্রেমিক অমিত বিশ্বের ছায়ার সঙ্গে নিজের ছায়া মিলিয়ে ফেলে কবিতার আবিষ্কারে তথা আত্মাবিষ্কারে রত। এই রতিই মূল অর্থে 'প্লেটোনিক লাভ'। মূল বক্তব্যে ফিরে গিয়ে বলি, রবীন্দ্রনাথের কাছে 'আলটিমেট' অর্থাৎ "শেষের" কবিতা বোধ হয় মিসটিক ভালোবাসার কবিতা।

এবার তৃতীয় উদ্ধৃতি (ওয়ালট হুইটম্যানের "প্যাসেজ টু ইনডিয়া" থেকে) দেখায় এটির উদ্ধার রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কতই স্বাভাবিক। তিনি নিজে কতবার 'পরানের সাথে' ঝড়ের রাতে ঝুলনখেলায় মেতেছেন, 'মানসসুন্দরী'কে নিয়ে বিপদসঙ্কুল সমুদ্রে নিরুদ্দেশযাত্রায় ভেসেছেন। Sail forth—Steer for the deep waters only, / Reckless O soul, exploring, I with thee, / And thou with me. / For we are bound where / mariner has not yet dared to go / And we will risk the ship, / Ourselves and all. সর্বস্বপণের খেলায় soul, শুধু soulmate হয়েছে। পরের পৃষ্ঠায় অমিত বলছে, 'বসে বসে ওই করি। পরের কথাকে নিজের কথা করে তুলি' (১০—দ্বিতীয় সাধনা)। প্রক্রিয়াটি রবীন্দ্রনাথে ঠিক বিপরীত : নিজের কথাকে পরের কথায় আবিষ্কার করা।

এখানে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক প্রয়াত শ্রদ্ধেয় কান্তিপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়কে। "গুপ্তধনে"র সরল ধাঁধাটির রহস্যোদ্ভেদে তিন পুরুষ লাগল কেন ভেবে মরি। আর 'বুঝ লোক যে জান সন্ধান'—ওই Oxford Book of Verse (পৃ ১০)-এর সংকেত সত্ত্বেও উদ্ধৃতিগুলির উৎস সন্ধানের চেষ্টা আমরা বাঙলা সাহিত্যের পড়ুয়ারা করি নি। যতদূর জানি প্রয়াত অধ্যাপক নিজের মনের প্রেরণায় এই প্রহেলিকার সমাধান করেছিলেন। বছর দশেক আগে আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে অকুণ্ঠ ঔদার্যে তৎক্ষণাৎ উৎসগ্রন্থটি বলে দেন—অধুনা দুর্লভ Oxford Book of English Mystical Verse। সেখানে তিনটি কবিতাই আছে : ক্যাথরিন টাইনান হিংকসনের "দ্য বিলাভেড", আরথার সাইমনসের "দি এক্‌স্টাসি" এবং ওয়ালট হুইটম্যানের "দ্য প্যাসেজ টু ইনডিয়া"। এই গ্রন্থটির সংকলন করেছিলেন ডি. এইচ. এস. নিকলসন এবং এ. এইচ. ঈ লী। "শেষের কবিতা" প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে, ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। বইটি বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে পাওয়া গেলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হত অমিত রায়ের স্রষ্টার হাতের কাছের বই ছিল কোন্‌টি। সৃষ্টি ও স্রষ্টার অভিন্নতা কুষ্ঠিতে জন্মলগ্নে চাঁদ থাকায় নয়, মনের গঠনে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই উপন্যাসের যেটি প্রধান ধাঁধা—অমিত-র অত্যুচ্চস্বরে বিঘোষিত রবীন্দ্রবিরোধিতা—উদ্ধৃতির উৎসের চাবিকাঠি হাতে এলে সেটি উদ্‌ঘাটিত হয় এই পরিহাসবিজড়িত একাত্মতারূপে। বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে এলেও 'quotes'-এর ক্ষেত্রে অমিত রায় আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাকার।

রবীন্দ্রনাথ ইংরাজি যেমনই জানুন, সংস্কৃতে তাঁর যে ব্যুৎপত্তি ছিল, সে বিষয়ে কারো মতদ্বৈধ নেই। খুঁজলে ভ্রান্তি মিলবে না কি তাঁর সংস্কৃতের বাঙলা অনুবাদে? শ্রদ্ধেয় আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একবার এক ঘরোয়া আলোচনায় বলেছিলেন মনে পড়ে—'প্রাচীন সাহিত্যে' রাজপ্রেয়সী হংসপদিকার গানটির যথাযথ অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ করেন নি। অনুবাদটি সাহিত্যপাঠকের অজানা নয়—

নবমধুলোভী ওগো মধুকর / চূতমঞ্জরী চুমি, / কমলনিবাসে যে প্রীতি পেয়েছ / কেমনে ভুলেছ তুমি।

মূলে মধুকর চূতমঞ্জরী পেয়ে কমলকে ভোলে নি। যে চূতমঞ্জরী (হংসপদিকা) আত্মদানের আবেগে সবটুকু মধু উজাড় করে দিয়েছে, তাকে ভুলে যে কমল তাকে মধুপান করতে দেয় না, শুধু বসতে দেয়—তারই কাছে গেছে কেন, এই প্রশ্ন করা হয়েছে।

অভিনবমধুলোলুপস্ত্বং তথা পরিচুম্বা চূতমঞ্জরীম্। /কমলবসতিমাত্র নির্বৃতো মধুকর বিস্মৃতোহস্যেনাং কথম্॥

(পঞ্চমাঙ্কের প্রারম্ভে)

এম. আর. কালে-র "অভিজ্ঞান শকুন্তলমে"র সংস্করণে টীকায় আছে—'তত্রাপি বসতিমাত্রং ন তু মধ্বাস্বাদস্তেনাপি নির্বৃতঃ সুখিত এনাং চূতমঞ্জরী কথং বিস্মৃতোহসি?' কারণ দেবী বসুমতী কোনো নূতন প্রিয়া নন, প্রথমা পত্নী—'বিক্রমোর্বশী'র রাজ্ঞী ঔশীনরী যেমন প্রথমা। রাজা তাঁরই কাছে আবার ফিরে গেছেন। ষষ্ঠ অঙ্কে এঁরই মনে দুঃখ আর ঈর্ষা জন্মাবার ভয়ে বিরহী রাজা নিজের আঁকা শকুন্তলার ছবিগুলি সরিয়ে ফেলেছেন।

এখন কী করে নিশ্চিত বলব এ ভ্রান্তি অজ্ঞতাসজ্জাত, ইচ্ছাকৃত নয়? "জীবনস্মৃতি"তে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছেন 'মন্দাকিনী নির্ঝরশীকর' ও (বোঢ়া মুহুঃ) 'কম্পিতদেবদারু'[১২] এই কথা দুটির ধ্বনিমাধুর্য যতটা তাঁর মন ভুলিয়েছিল, সম্পূর্ণ শ্লোকার্থ ততটাই হতাশ করেছিল। প্রথমাঙ্কেই কমলের সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা। শকুন্তলার মুখকমলে আকৃষ্ট মধুকরের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে দুষ্মন্তকে ডাকার উপদেশ দিয়েছে সখীরা। ভোজনের ক্ষেত্রে মিষ্ট পিণ্ডখর্জুর থেকে অম্ল তিন্তিড়ীর রসাস্বাদ যিনি নেন, বৈচিত্র্যপিয়াসি সেই রাজা মধুকররূপে উৎকৃষ্ট কমলমধুপান ভুলে চূতমঞ্জরীর রসাস্বাদে মজবেন—এটাই আরো স্বাভাবিক আর সংগত মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথের। ফলে নিজের অভিপ্রায়ানুগ করে ঈষৎ পরিবর্তন করেছেন তিনি শ্লোকার্থে, ভ্রান্তিবশত নয়—এই অনুমান বোধ করি অসংগত নয়। রবীন্দ্রসমালোচনায় শুধু প্রমাদ আহরণের বিলাস ছেড়ে অন্যদিকে দৃষ্টি দেবার সময় কি এখনো আসে নি—ধরুন তাঁর হাতে পৌরাণিক কাহিনীর নব রূপায়নে? সেই অনুসন্ধান আরো সম্ভাবনাময়।

করবী দাশগুপ্ত

ডিসেম্বর ১৯৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত "মহাক্ষণের প্রতীক্ষায়" প্রবন্ধে কয়েকটি নাটকের নাম অশুদ্ধভাবে ছাপা হয়েছে। শুদ্ধ রূপগুলি এখানে দেওয়া হল (বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত অশুদ্ধ রূপ)। এই ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।—সম্পাদক

পৃ ৬৩১ রাজা অয়দিপাউস (আদিপাউস); পৃ ৬৩৩ অমিতাক্ষর (অমিত্রাক্ষর); পৃ ৬৩৩ গ্রটোস্কি (এটোস্কি); পৃ ৬৩৫ আগশুদ্ধি (আত্মশুদ্ধি); পৃ ৬৩৫ রোশন (রোপন)।

চীনা কাঠখোদাই

বিড়লা অ্যাকাডেমির প্রদর্শনীকক্ষে চীনা কাঠখোদাই প্রদর্শিত হল ২০-৩০ নভেমবর। এই চিত্রসম্ভার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা প্রথমেই বলে রাখি। এই প্রদর্শনী আমাদের সহজেই বোধগম্য এবং আনন্দদায়ক। এক কথায়, আমাদের সঙ্গে খুব সহজেই এই ছবিগুলির এক সম্পর্কস্থাপন হওয়া সম্ভব। সম্প্রতিকালের কোনো প্রদর্শনীতে গিয়ে এই র‍্যাপোর্ট, এই নিটোল তৃপ্তি তৈরি হয় নি। প্রধানত পাওয়া যায় সুররিয়লিজমের ছায়া। অথচ সুররিয়লিজমের প্রাসঙ্গিকতা আজ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। দালি, রেনে মাগ্রিত, পল হ্যাশরা তাঁদের দর্শকদের যে ধাক্কা দিতে চেয়েছিলেন, সে ধাক্কা খেতে-খেতে আজ আমরা অভ্যস্ত, ক্লান্তও। প্রদর্শিত ছবিগুলির প্রেক্ষাপট আমাদের শহুরে জীবনের সমস্যা থেকে দূরে এক শেকসপীয়রীয় আরডেনে। অথচ এ কোনো এসকেপিসট সুখস্বপ্ন নয়। এ এক পরিচিত বাস্তব জগৎ, যেখানে মানুষকে খেটে খেতে হয় এবং জীবন চলে সাবলীল শান্ত অথচ নিরলস এক নিজস্ব ছন্দে।

কাঠখোদাই প্রধানত চীনা নববর্ষ (যা এখন বসন্ত-উৎসব নামে খ্যাত) উপলক্ষে সৃষ্টি হয় ইয়াং লিউকিং, উইক্যাং এবং তাওহুয়ায়ুতে। এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে এই তিন স্থানেরই প্রিনট। কয়েক হাজার বছরের গৌরব-উজ্জ্বল অতীতের বহন করছে এইসব কাঠখোদাই ছবি। এই চিত্রশিল্পের গোড়াপত্তন হয় ৭৮০-১২৭৯ খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গ বংশের রাজত্বকালে। অতীতে ছিল হস্তশিল্প, এই সময় থেকে কাঠের ব্লক-প্রিনটিং শিল্পরূপে প্রকাশ পায়। মিঙ্গ বংশের (১৩৬৮-১৬৪৪) এক নিদর্শন এবং চিঙ্গ বংশের (১৬৪৪-১৯১১) ২৬টি ছবি এ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া আছে কয়েকজন আধুনিক শিল্পীর ৩০টি ছাপা। এখানে বৃহৎ চীনা ল্যানডস্কেপ-চিত্রের বড়ো মাপের ব্রাশস্ট্রোক পাওয়া যায় নি। পাওয়া যায় নি সূক্ষ্ম তুলির আঁচড়। অথচ পাওয়া গেছে তপ্ত উজ্জ্বল রঙের স্ফুরণ, যা বসন্তকালকে মনে করিয়ে দেয়।

অতীতের রীতি বজায় রেখে আধুনিক শিল্পীরা একই আঙ্গিকে যে শিল্প সৃষ্টি করেছেন, তাতে অতীতের মৌলিকতা আর স্বতঃস্ফূর্ততা কতকটা ক্ষুণ্ণ হলেও অতীতের প্রভাবও অটুট, বিশেষত রঙের ব্যবহারে। কেবল ওয়াংজুড-নামক শিল্পীর কাজে অতীতের পূর্ণগাম্ভীর্য এবং স্থৈর্য পাওয়া যায়। তিনি এই শিল্পের এবং সময়ের বিবর্তনের ধারাকে ধরে রাখতে পেরেছেন তাঁর ছবিতে। অথচ, পাশাপাশি জুয়াংশুর "গুশানিন" চিত্রে দেখি অতীতের অন্ধ অনুকরণ, সি বাংগহুয়ার "এ ওয়ানডারফুল রিজারভোয়ার" ছবিতে পাই অতীতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, এবং ওয়াং কাতাংগের "মাই ফ্যামিলি হ্যাজ অ্যানাদার নিউ ট্র্যাকটর"-এ পাই নির্জীব মৌলিকতার চেষ্টা।

ছবিগুলি পোসটারের মতো দেওয়ালের বা প্রবেশদ্বারের উপর টাঙানো হয়, তাই এদের মধ্যে পাওয়া যায় বাস রিলিফ (bas relief) এবং রেখাঙ্কনের প্রাধান্য—যা থেকে সৃষ্টি হয় এক আশ্চর্য ফ্ল্যাট ডাইমেনশনের এফেকট। এই অভিনব চিত্রগুচ্ছের মধ্যে বিরাজ করে এক প্রশান্তি, এক সূক্ষ্ম হিউমার এবং দর্শকের কাছে পৌঁছে দেয় এক টাটকা সজীবতা। গৃহস্থালির সাধারণ এবং গতানুগতিক মুহূর্তগুলি ধরা হয়েছে নিখুঁত ডিটেলের মাধ্যমে।

এই ছবিগুলির আর-এক বৈচিত্র্য হল সমতা (সিমেট্রি) এবং শৃঙ্খলার সমাবেশ যা খুব সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পায় "দ্য হল অব লয়ালটি অ্যানড জাসটিস" এবং "গড্‌স্" চিত্রে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, "দ্য হল" অন্যান্য ছবিগুলির মতো কৃষকের খামারবাড়ি অথবা ঐশ্বর্য আর ভাগ্যের দেবদেবীর ছবি নয়। ছবিটির বিষয় এক জাঁকজমকপূর্ণ বিচারসভা। ছবিটির মধ্যে এক ক্লাসিকাল মাত্রা প্রস্ফুটিত হয়েছে। ফ্ল্যাটনেসের পরিবর্তে পাওয়া যায় এক আশ্চর্য পরিপূর্ণতা এবং শুদ্ধতার ব্যঞ্জনা।

বিষয়বস্তুর প্রতি শিল্পীর গভীর মমত্ববোধ এই ছবিগুলির আবেদন আরও বাড়িয়ে তোলে। কিছু-কিছু নৈর্ব্যক্তিক ছবি, যেমন "দ্য এইট বিউটিস্ কমপিটিং ইন মারশিয়াল আর্টস"-এ এই গভীর মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। শিল্পীদের ভরাট নিশ্ছিদ্র আর বৈচিত্র্যময় রঙের ব্যবহারে গ্রাম্য পরিবেশ আর গ্রামীণ নরনারী, পশুপাখি, শিশুর যে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, প্রাণোচ্ছল চিত্র অনবদ্যভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে চোখের সামনে তা সত্যিই অতি সাধারণ মনকেও নাড়া দেয়।

মিঙ্গ চিত্রটিতে (গ্রিটিংস্ দ্য গড্ অফ লনজিভিটি) এক হলুদ আঙরাখা-পরা দেবতা, যার চারপাশে ঘিরে রয়েছে চীনদেশের সুপ্রসিদ্ধ বিনুনি-বাঁধা বাজনাবাদকের দল। ছবিটির গতি স্পষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য। এই শান্ত, স্থির গতিময়তা এই প্রদর্শনীর আর-এক প্রধান বৈশিষ্ট্য—ঐশ্বর্যও বলা যেতে পারে।

প্যামেলা সরকার

IN-LAWS OR OUTLAWS

There is nothing like a dowry to give any marriage a bad name. And a bad start

It takes your son's pride away
It makes your daughter lose her dignity
It strains family relations for generations to come.

Help eradicate dowry.
Educate your children.
Don't subsidise a marriage.

Remember, Dowry is prohibited by law

Progressive-UIB-6/86

UIB—With the people... for the people.

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED
Head Office : 17, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700 001
Regd. Office : 7, Red Cross Place, Calcutta-700 001